নারী, নগরী

নারী, নগরী

কেতকী কুশারী ডাইসন

॥ এক ॥

তাত্য়ানা আস্তনভকে আমি প্রথম দেখি য়েলিৎসার ঘরে। রাত তখন প্রায় ন'টা ; য়েলিৎসা আর আমি নৈশ ভোজনের পর যথারীতি প্রাক্-নিদ্রা আড্ডা দিচ্ছি। আড্ডা হোতো কোনোদিন আমার ঘরে, তিন নম্বরে, কখনো বা য়েলিৎসার ঘরে, পাঁচ নম্বরে। পাঁচ নম্বর ঘরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তার আকৃতিতে প্রস্থের চাইতে দৈর্ঘ্য ছিলো বেশি, ঘরটিকে দেখে মনে হোতো সরু লম্বা একটা করিডর। কিন্তু সে কারণেই হোক, অথবা সে ঘরের আশ্চর্য অধিকারিণীর ব্যক্তিত্বের গুণেই হোক, কি দিন কি রাত্রি সব সময়ই ঘরটিতে নীড়ের মত একটা উত্তাপ জমাট হয়ে থাকতো। সে রাত্রেও যথারীতি হলুদ পর্দা টানা, টেবিলবাতির স্বল্প আলো, আর জ্বলন্ত রেডিয়েটর। সে ঘরে তখন আরও ছিলো ইরিনা মরজভ, য়েলিৎসার দেশের লোক। অবশ্য অংশত, কারণ বেলগ্রেডে জন্মালেও ইরিনা তার রুশ উত্তরাধিকারের কথা একেবারেই ভুলতে পারে নি, এমন কি সার্বিয়ানদের চেয়ে রুশরা যে কত বেশি উচ্চস্তরের জীব সে বিষয়েও সে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলো। য়েলিৎসা ইরিনার ছেলেমানুষী দৃষ্টিভঙ্গিকে ক্ষমার চক্ষেই দেখতো। সে দিনও ইরিনা যখন বিড়বিড় মন্ত্র উচ্চারণ করে তাস সাজিয়ে আমার ভাগ্যগণনার চেষ্টা করছিলো এবং ফাঁকে ফাঁকে বলছিলো তার মা কি দারুণ জ্যোতিষী, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নাকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এক হাত দেখার রুশ ভেল্কি দেখিয়েই সরল

বেলগ্রেডবাসীদের ভুলিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন, তখন য়েলিৎসা ওর কথায় বিশেষ কান না দিয়ে ভাবছিলো যে এখনও যদি ইরিনা না ওঠে তবে আর কিছু বাদেই ইচ্ছা করে শেষ বাসটি হারাবে এবং তারপর তাকে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ঠিক এই সময়েই পাঁচ ঘরের দরজায় টোকা পড়লো, এবং কি আশ্চর্য, ঘরে ঢুকলো রেডিয়েটরের জন্য শিলিং-প্রার্থী হবু সন্ন্যাসী এডওয়র্ড রায়ান নয়, একজন অপরিচিতা সুবাসিতা রূপসী আধুনিকা।

গড়পড়তা বাঙালী মেয়ের মত ছোটখাট শরীর, মুখখানি যেন ইরানী রাজকুমারীর। মনে হোলো লজ্জাচকিতা, এক নজরেই বুঝলাম বিদেশিনী। সন্দেহ রইলো না যখন লজ্জাগ্রস্ত চোখদুটি য়েলিৎসার দিকে তুলে এক নিশ্বাসে অনর্গল রুশ বলতে শুরু করলো। কথার তোড়ের মধ্যে থেকে বুঝতে পারলাম বারবারই অবলিয়েনস্কি আর দ্রজ্‌দভ দম্পতীদ্বয়ের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। তখনই অনুমান করলাম ব্যাপারটা। পরে শুনলাম বিস্তৃতভাবে। অক্সফোর্ড এলাকায় স্লাভ সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা যে যেখানে আছে তাদের কারোরই নিস্তার নেই সেণ্ট—হাউজের কর্তৃপক্ষের নজর থেকে। তা ছাড়া, কি রুশ, কি সার্ব, কি গ্রীক, কি দক্ষিণ ভারতীয়, প্রাচ্য অর্থডক্স গীর্জার অন্তর্ভুক্ত হলে তো কথাই নেই। সবাইকে যেনতেন প্রকারেণ ভুলিয়ে ধর্মকেন্দ্রিক চায়ের আসরের অছিলায় আদর-অ্যাপায়ন করে সন্তদের পুণ্য পতাকার নিচে জড়ো করাই ছিলো নিঃসন্তান স্নেহবুভুক্ষু দ্রজ্‌দভ-দম্পতীর জীবনের ব্রত। প্রাচীনপন্থী খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যগুণে অনেক কৌতূহলো-দ্দীপক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রই জমায়েত হোতো তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায়, এবং হিন্দুধর্মও বাদ যেতো না তাঁদের বিভিন্ন আসরের আলোচনা থেকে। খ্রীষ্টধর্মের পরেই তাঁদের চিন্তাধারায় হিন্দুধর্মের স্থান।

ভারতীয় হিন্দুদের সেণ্ট—হাউজে থাকাটা পর্যন্ত রেওয়াজে পরিণত হয়েছিলো। টেইলরিয়ান ইনস্টিটিউটে রুশ ভাষার শিক্ষয়িত্রী হয়ে অক্সফোর্ডে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাত্য়ানা সন্তদের পুণ্য গণ্ডীর ভেতরে এসে পড়লো। উপায় ছিলো না। প্রথমেই প্রাক্তন রাজকুমারী অবলিয়েনস্কির গৃহে খাঁটি রুশ আতিথেয়তা গ্রহণ, অতঃপর অবিলম্বে মারিয়া দ্রজ্দভের একনায়িকাত্বের রাজত্বে পদার্পণ। মিসেস দ্রজ্দভ আগে থেকেই তাক করেছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্যারিস থেকেই খবর পেয়েছিলেন যে তাঁদের ‘এমিগ্রে’ সমাজের অন্যতম গুণবতী মেয়ে তাত্য়ানা আস্তনভ এক বছরের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈর্ষণীয় চাকুরি নিয়ে আসছে। অক্সফোর্ড শহরের রুশ তথা অর্থডক্স খ্রীষ্টীয় সমাজের অলংকার হিসাবে তাকে হরণ করবার জন্য সমস্ত জাল পেতে প্রস্তুত ছিলেন। চ্যাপেলের সমবেত গ্রেগরিয়ান সংগীতেও আর একটি দুর্মূল্য নারীকণ্ঠের যোজনা হবে ভরসা রেখেছিলেন।

এক নম্বর ঘরের টিমথি ওয়্যার তখন জেরুজালেমে হিব্রু শাস্ত্রে নিমগ্ন ছিলো। তার গ্রন্থসমাকুল ঈষদন্ধকার একতলার ঘরে তাত্য়ান থাকতে এলো। আমার ঘরের নিচেই। টিমথি থাকাকালীন তার গ্রামোফোন থেকে যে নিরন্তর গ্রেগরিয়ান সংগীতের ওঠাপড়া এব জোরালো আলোচনার সঙ্গে টিমথি-এডওয়র্ডের কাষ্ঠভেদী যুগ অট্টহাস্য তাদের ছাদ এবং আমার মেঝে বিদীর্ণ করতো, তার বদলে এক নম্বরে এলো এক নতুন মার্জিত নীরবতা। মারিয় আমাদের বললেন তাত্য়ানার সঙ্গে ভাব করতে, কিন্তু সাবধানে প্যারিসের মেয়ে তো, কখন কি ভাবতে কি ভেবে বসে ঠিক নেই অধিকাংশ সময়ই এক নম্বরের অভ্যন্তরে প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব কর

যেতো না। কারণ তাত্য়ানা অধিকাংশ সময়ই লাইব্রেরীতে থাকতো, এবং যে সময়টুকু ঘরে থাকতো তখনও চুপ করে পড়াশোনা করতো।

তাত্য়ানা প্রায় না খেয়েই থাকতো। সকালে এক কাপ কালো কফি আর ছু' একটি কৃশ বিস্কুট, তুপুরে ফিরলে এক চিলতে শুঁটকী হ্যাডক্ এবং আরেক কাপ কালো কফি, রাত্রে কখনও তুটি টোমাটো, কখনও ছু' চামচ ভাত বা স্প্যাগেটি মাখন দিয়ে এবং তৃতীয় কাপ কালো কফি। কালো কফি খেতো পড়াশোনার সময় ঘুম তাড়াবার জন্য। আমি আর য়েলিৎসা, যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব রান্নাঘরেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, রীতিমত অবাক হতাম। তাত্য়ানার সামনে একটা ডিপ্লোমা পরীক্ষা ছিলো—সেটা সে প্যারিসে উড়ে গিয়ে দিয়ে আসবে—সেজন্যে সে দিনরাত বই খুলে বসে থাকতো। আমরা তাই আরও বেশি করে তার পুষ্টির জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তাত্য়ানা বলতো যে বেশি খেলেই ওর একটা পেটব্যথা হয়, কিন্তু আমরা জানতাম কম খেয়ে খেয়েই ও পেটের সর্বনাশ করেছে। তাত্য়ানাকে আমরা আমাদের রান্না একটু আধটু দিতে শুরু করলাম। প্রথমে লজ্জিত আপত্তির পর একটু একটু খেতো, কিন্তু ছু' এক চামচের বেশি না। তাত্য়ানা প্যারিসের মেয়ে, নিশ্চয় খাঁটি কফির কদর বোঝে, এই ভেবে আমরা আমাদের সযত্নে পারকোলেট্ করা কফি ওকে খাওয়াতে সচেষ্ট হলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য, তাত্য়ানা খাঁটি কফির গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারতো না, নেস্ক্যাফেতেই ছিলো ওর সন্তুষ্টি।

তাত্য়ানা আমার কাছে ফেন না ফেলে দমে ভাত রাঁধতে শিখবে এই মর্মে আরজি পেশ করলো। আমার কথামত বাজারের নির্দিষ্ট

দোকান থেকে ছোট প্যাকেটে বাসমতী চাল কিনে আনলো ঠিকমত রাঁধতে পারতো না কোনোবারই। চড়াবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডেকচির ঢাকনা খুলে ওলটপালট করতো এবং ভাত টিপতে শুরু করতো। যখন বলতাম এখনও হয়নি, তখন বই হাতে ঘরে অন্তর্হিত হোতো, কিন্তু দু' মিনিট পরেই আবার হাজির আশান্বিত ব্যগ্র চোখে: 'ইজ্ ইত্ দান্, কেতকী?' তখন আবার বোঝাতাম, চড়া আঁচে এত মিনিট, ঢিমে আঁচে আরও এত মিনিট। এবার সে এত দীর্ঘকালের জন্য অন্তর্হিত হোতো যে ভাত তলায় লাগতো। প্রায়ই দেখতাম টেইলরিয়ানে যাবার আগে ব্যস্তভাবে পোড়া বাসন মাজছে। শেষে ওর ধ্রুব বিশ্বাস হোলো ঝুরঝুরে ভাত রান্না করার ম্যাজিক আর্ট ওর কখনও আয়ত্ত হবে না। তাত্য়ানা ভাত খেতো শুধু মাখন দিয়ে, কারণ অন্য কিছুর সঙ্গে ও ভাতের বিশিষ্ট স্বাদটা পেতো না। রীতিমত ভাতরসিক ছিলো। শেষদিকে শুধু ভাত-মাখন খেয়েই থাকতো। আমরা ওর আহারের প্রোটিনাল্পতায় আশঙ্কিত হতাম।

তাত্য়ানা উত্তাপের জন্য শিলিং খরচ করতে চাইতো না। হিমের মধ্যেও হি-হি করতে করতে বই খুলে বসে থাকতো। অগত্যা আমরা ওর স্বাস্থ্যচিন্তায় কথাটা মারিয়াকে জানালাম। তিনি ওকে অনুমতি দিলেন বসবার ঘরে রাত্রে পড়বার, সেখানে সেণ্ট্রাল হীটিং ছিলো। অনেক রাত্রেও আমরা দেখতাম হয় সে ঘরে নয় ওর নিজের ঘরে দরজার নিচে আলোর রেখা জ্বলছে।

গণ্ডগোল বাধলো মারিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুণ। রুশদেশীয় খ্রীষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ সরব হোলো না তাত্য়ানা। রোববার সকালে প্রার্থনাকক্ষে আসতে দেরি হোতো মধ্যে মধ্যে।

এক আধ দিন বেশি দেরি হয়ে গেলে আদৌ যেতে চাইতো না। 'আমি যেতে বাধ্য নই।' গলা খুলে গাইতো না। 'আমি গাইতে পারি না।' একদিন ইংরেজীতে সার্ভিস হোলো। রুশ সার্ভিসেরই আগাগোড়া অনুবাদ, ইংরেজ গায়কগায়িকারা এলো। সেদিন দেখলাম ডাঃ দ্রজ্‌দভ নিজে বহুক্ষণ কাকুতিমিনতি করছেন, আর তাত্‌য়ানা সংকুচিত হয়ে না-না করছে। তাত্‌য়ানা বলছে যে, সার্ভিস ও বুঝতেই পারবে না, শুধু শুধু গিয়ে লাভ কি। 'আমি ধর্মের জন্য গীর্জায় যাই, মজা করতে নয়, চ্যাপেল ইজ নত্‌ তেয়াত্‌র।' অর্থাৎ চ্যাপেল থিয়েটার নয়। সেদিন একটু রাগই করেছিলাম তাত্‌য়ানার উপর, বৃদ্ধ দ্রজ্‌দভকে নিরাশ করতে দেখে। কিন্তু আসলে তাত্‌য়ানা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো যে মারিয়ার শাসনের ভিতরে সে কিছুতেই আসবে না। এমিগ্রে রুশ জীবনের বাঁধাধরা ছকের মধ্যে সে কিছুতেই ধরা দিতে চাইলো না। টার্মের গোড়াতে হাউজের বাসিন্দাদের যে সভা হয় তাতে প্রত্যেককে দিতে হয় জাতি, ধর্ম, পেশা ইত্যাদি বিষয়ে আত্মপরিচয়। যখন তাত্‌য়ানার পালা এলো তখন দ্রজ্‌দভ-দম্পতী পরম স্নেহভরে তাঁদের স্মিত দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ করে রইলেন। তাত্‌য়ানার রুশ রক্তে তাঁদেরই জয়কার। তাত্‌য়ানা ফরাসী মেয়েদের কায়দায় তার তনু অঙ্গ কিঞ্চিৎ সঞ্চালিত করে দেয়ালের বাতির দিকে. তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললো, 'আমি টেইলরিয়ানে রুশ ভাষার শিক্ষয়িত্রী, আমি অর্থডক্স এবং আমি ফরাসী।' আমি আর য়েলিৎসা দৃষ্টি বিনিময় করলাম। কয়েক মুহূর্ত বাদে এলো স্বয়ং মারিয়ার পালা। তিনি কি বলবেন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি বললেন, 'আমি সেণ্ট—হাউজের কর্ত্রী, আমি অর্থডক্স, এবং আমি রুশ, বিশুদ্ধ রুশ।' আমরা চোখ নামিয়ে বসে রইলাম। তাত্‌য়ানা ইচ্ছে করেই,

মারিয়াকে চটানোর উদ্দেশ্যেই নিজেকে ফরাসী বলে ঘোষণা করেছিলো। পরে আমাদের বলে :—'কেনই বা নিজেকে রুশ রুশ বলে জাহির করবো? যে দেশে জন্ম, যে দেশের রুটিতে মানুষ, যেখানকার স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, সে দেশের নাম আগে বলবো, না বলবো সে দেশের নাম যে দেশ ছেড়ে পূর্বপুরুষ পালিয়ে এসেছিলো? সহ্য করতে পারি না এমিগ্রে রুশদের দেশপ্রেম। বেশ তো, ফিরে যাও না নিজের দেশে, সেদিকে তো সাহস নেই। এদিকে বিশ বছর যাবৎ ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে আছো, এসেছিলে ফকির হয়ে, ব্রিটেনেরটা খেয়ে পরে আজ মাতব্বর হয়েছো, অথচ পরিচয় দিতে গেলে বিশুদ্ধ রুশ!'

তাত্য়ানা আর মিসেস দ্রজ্দভের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে চলতে লাগলো। অবশেষে গোলমাল বাধলো ক্রিসমাসের ছুটির সূচনায়। তাত্য়ানা ছুটিতে প্যারিসে চলে যাবে, ছুটির ছ' সপ্তাহের জন্য সে ঘরভাড়ার অর্ধাংশ 'রিটেইনিং ফী' বাবদ দিতে প্রস্তুত নয়। মারিয়া নাছোড়, অক্সফোর্ডের ঘরভাড়ার এই নিয়ম, ছুটির পর একই ঘরে ফিরে আসতে হলে ফী দিতে হয়। তাত্য়ানাও নোটিশ দিলো, ছুটির পর তাহলে সে আর এই ঘর ভাড়া নিতে চায় না। তখনই আরম্ভ হোলো তুমুল কলরব। তাত্য়ানাকে ইংরেজী শেখাবার উদ্দেশ্যে মারিয়া নিয়ম করে দিয়েছিলেন সে যেন সকলের সঙ্গে ইংরেজীই বলে, তাঁর সঙ্গেও। অগত্যা বেচারী তাত্য়ানা তার ঘর ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত বেশ নম্র গলায় তাঁকে জানালো, সহজ নিরলংকার চারটি ইংরেজী কথায়, 'আই ক্যানত্ লিভ্ হিয়ার।' মারিয়ার চোখে জ্বলে উঠলো আগুন, মুখে ঘৃণা :—'তাত্য়ানা আস্তনভ, হোয়াত দিদ্ ইউ সে?'

—'আই ক্যানত্ লিভ্ হিয়ার।'

তাত্য়ানা বলতে চেয়েছিলো, 'তাহলে—অর্থাৎ ফী দিতে হ'লে—আমাকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে, আর্থিক কারণে।' কিন্তু মারিয়া মানে করলেন, 'আমার পক্ষে এ বাড়িতে বাস করা আর সম্ভব নয়।' আত্মহারা হয়ে পড়লেন তিনি। দোতলার বারান্দা থেকে আমরা শুনলাম একতলায় তাঁর ক্রুদ্ধ উচ্চস্বর :

—'মাই দিয়ার গার্ল, ইউ ক্যানত্ সে দ্যাত্, স্পিক ইন রাশান প্লীজ।' আর তারপর ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়তে লাগলো নারীকণ্ঠের রুশ, কখনও যুগপৎ দ্বৈত কণ্ঠে, কখনও দ্রুত লয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তরে।

পরদিন দুপুরে মারিয়া আমার ঘরে এলেন। 'কেতকী, তোমরা ওকে বোঝাও না, ওকে গুছিয়ে বলো। মেয়েটা রাগের মাথায় ঘর খুঁজতে বেরিয়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সাধারণ ল্যাণ্ডলেডীর সঙ্গে ও কি সুখী হবে? এখানেই তো ওর আপনার জনেরা রয়েছে। তুমি আর য়েলিৎসা ওকে এ বাড়িতে থেকে যেতে অনুরোধ করো।' আমরা অবশ্য বলেছিলাম আগেই। কিন্তু তাত্য়ানা রাজী হয় নি। বলেছিলো :

—'ভেবো না, ঘর আমি পাবোই, আর সেটাই ভালো হবে। মারিয়ার রাজত্বে টেকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তোমরা তো রুশ নও, তাই ঠিক বুঝতে পারছো না। আমি রুশ বলেই আমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ নিজের করায়ত্ত করতে চান মারিয়া। আমার তা সহ্য হবে না। আমি থাকবো কাছাকাছিই, আসবো তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে।'

আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ অন্য এক বাড়িতে ইংরেজ বাড়িউলির ঘরে উঠে গেলো তাত্য়ানা। ভাড়ার মধ্যে

উত্তাপের খরচ ধরা আছে, আলাদা করে শিলিং খরচ করতে হবে না। ফাঁকা বাড়ি, ভিড় নেই, যখন খুশি রান্নাঘর ব্যবহার করতে পারবে। তা ছাড়া পাচ্ছে ঘরে বসে চা তৈরির জন্য বৈদ্যুতিক কেটলী। পিছনের বাগানে সূর্যস্নানের সুযোগ অপর্যাপ্ত। বন্ধুরা ইচ্ছামত আসবে যাবে, কোনো নিষেধ নেই। সবার উপরে ছুটিছাঁটায় 'রিটেইনিং ফী' লাগবে না। যাবার সময় মারিয়ার সঙ্গে বিশেষ সদালাপ হোলো না। চোখদুটি ছলছল হয়ে এলো ডাঃ দ্রজ্‌দভের—'—তোমার জন্য দরজা সবসময়ই খোলা রইলো কিন্তু। ইচ্ছে হলেই আবার ফিরে এসো। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে অবশ্যই আসবে। আর—' থমকে গেলেন বৃদ্ধ, থেমে বললেন—

—'রোববার রোববার সকালে চ্যাপেলে আসবে তো?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

ডিসেম্বরে য়েলিৎসা বেলগ্রেডে ফিরে গেলো। জানুয়ারী মাসে তাত্‌য়ানা প্যারিস থেকে অক্সফোর্ড ফিরলো। এক রোববার সকালে বেলা বারোটা নাগাদ আমার দবজায় টোকা। নতুন একটি ঘিয়ে রঙের পোশাকে তাত্‌য়ানা।

—'চ্যাপেলে এসেছিলাম।'

—'কফি খাবে?'

—'হ্যাঁ, নেস্‌ক্যাফে কিন্তু!'

—'জানি, মনে আছে!'

যাবার সময় য়েলিৎসা আমাকে বলে গিয়েছিলো তাত্‌য়ানা প্যারিস থেকে ফিরে এলে ওর সঙ্গে ভালো করে ভাব করতে—

—'মেয়েটা খামখেয়ালী, ওর একটু দেখাশোনা কোরো। এমনিতে অহংকারী, প্যারিসিয়েন্ তো, কিন্তু আসলে সঙ্গ চায়। সেধে

ভাব করবে না, কিন্তু ভাব করলে খুশী। তা ছাড়া তুমিও ভালো সঙ্গী পাবে। আমি তো চললাম, তোমার তাত্য়ানা রইলো।'

শিগগিরই তাত্য়ানার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হোলো। স্লাভদের সঙ্গে আমার এই গূঢ় যোগ দেখে মারিয়া বিস্মিত হলেন। 'প্রাচ্য যোগ' বলে কথাটার তা হলে সত্যিই অর্থ আছে? তাত্য়ানার ঘরখানি ছিলো সুন্দর। ও অনাহারী ছিলো দেখে আমি প্রায়ই ওকে জোর করে আমার সঙ্গে খাইয়ে দিতাম। ও আবার আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাত দশটার সময় নেস্‌ক্যাফে খাওয়াতো। একদিন আমি বললাম—

'তাত্য়ানা, আইরিশ কফি খেয়েছো?'

—'সে কি রকম?'

—'কিছুই না, প্রথমে বাদামী চিনি, তার পর কালো কফি, তার পর কয়েক চামচ হুইস্কি, তার উপর ক্রীম।'

—'কি আশ্চর্য, আমার কাছে আধ বোতল হুইস্কি আছে, বেশ তো, দেখা যাক।'

সেই আধ বোতলে আমাদের দু'মাস আইরিশ কফি খাওয়া হয়ে গেলো। তাত্য়ানা কার জন্য হুইস্কি কিনেছিলো সেটাও ক্রমে জানতে পারলাম।

॥ দুই ॥

ক্রমশ আমি তাতয়ানা আস্তনভ নামক মানুষটির মনের বিভিন্ন চাবিকাঠির মোচড়, তার কলকজার নড়াচড়া বুঝতে শুরু করলাম। স্মিতহাস্য রঙিন ঠোঁট দুটি, স্বচ্ছ সুন্দর চোখ, সর্বদাই মুখখানির পিছনে একটা বিষণ্ণতার আভাস আবছাভাবে উঁকি দিতো। হয়তো অনেক উৎসাহ নিয়ে তার ছাত্রদের কথা বলছে, বা বলছে টেইলরিয়ানের আগামী রুশ নাট্যাভিনয়ের প্রস্তুতির কথা; হয়তো চলছে ইংরেজ মেয়েদের জামাকাপড় নিয়ে রসিকতা কিংবা ইংরেজ জীবনের কোনো দিক নিয়ে বিশুদ্ধ খিস্তি;—হঠাৎ যেন সব অর্থহীন মনে হয় তাতয়ানার কাছে, ক্লান্তি আসে তার সমস্ত আলোচনায়, নিমেষে সে তার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে বসে, কি ভবিষ্যতের স্বপ্নে, কি অতীতের প্রশংসায়, কি বর্তমানের সমালোচনায়। আস্তে আস্তে তাকে আমি প্রশ্ন করি প্যারিসের কথা, ইংলণ্ডে তার অভিজ্ঞতার কথা। প্যারিস তার কাছে অসম্ভব আপনার, এবং প্রাণোচ্ছলতার প্রতীক; আবার কখনও কখনও প্যারিস বন্দীশালা। অক্সফোর্ড রমণীয় শহর, কি স্থাপত্যে কি প্রকৃতিতে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা একটু মজার; সকলেই খুব একটা চালাক নয়, অথচ কেউ কেউ অসম্ভব তীক্ষ্ণ, অসম্ভব ক্ষুরধার। কখনও অক্সফোর্ড-প্যারিস দুই-ই বন্দীশালা, কখনও দুই-ই খোলা মাঠ। অনুমান করলাম প্যারিস তো বটেই, অক্সফোর্ড-সম্পর্কেও এই ক' মাসেই তার করুণরঙিন কোনো বিশেষ অনুরাগ জন্মেছে। ক্রমে ক্রমে

তাকে বলতাম, 'তাত্য়ানা, বলো তোমার মনের কথা।' প্রথম প্রথম হেসেই উড়িয়ে দিতো—'তোমাদের সব ঐ এক দিকেই নজর। সেসব কিচ্ছু না।' আমি বলতাম—

—কেন বিশ্বাস করবো ? তোমার বয়স কত ?

—উনত্রিশ।

—তবে ? না হয়েই যায় না। প্যারিসিয়েন্ তুমি। না জানি কত রূপকথা তোমাকে ঘিরে আছে।

আস্তে আস্তে সবই বলেছিলো। যতটা পরিষ্কার করে ও বলতে পারে। কারণ আজ পর্যন্তও আমি জানি না তাত্য়ানা সত্যি কী চায়। জানে না সে নিজেও। এবং সেটাই ওর জীবনের থিওরি। অর্থডক্স বলে নিজেকে ঘোষণা করলেও বস্তুত মূল অর্থে তাত্য়ানা ছিলো অ্যাগ্নস্টিক্, অজ্ঞেয়বাদী। কিছুই জানা যায় না। 'যায় কি, সত্যিই তাই কি', বা 'তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো, কিন্তু···' এ ধরনের দৃষ্টিকোণ ছিলো তার পক্ষে মার্কামারা। মারিয়া দ্রজ্দভের ধরনের রুশ জাতীয়তাবাদ সে বরদাস্ত করতে পারতো না, অথচ তার সমস্ত ফরাসী আচারব্যবহারের অন্তরালে ছিলো রুশ সংস্কৃতির প্রতি এক তীব্র অনুরাগ। দুঃখ করে বলতো, তার জেনারেশনের এমিগ্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রুশ ভাষায় কথাবার্তা বলা দুর্লভ হয়ে আসছে, পরবর্তীরা আর বলবে না, তারাই শেষ রুশভাষী। অথচ এটা যে অবশ্যম্ভাবী তা স্পষ্টই স্বীকার করতো। যুব-উৎসব উপলক্ষ্যে ও দুবার মস্কো গিয়েছিলো। তাই বলতো—

'মারিয়া যে-রাশিয়া ছেড়ে এসেছেন সে তো আর নেই। উনিশ বছর বয়সে দেশ ছাড়ার পর তিনি আর ওমুখো হন নি। এখনকার রুশরা কি বলছে, কি ভাবছে, তা তিনি জানতে চান না, দূরে সরিয়ে

।খতে চান। তাই তো তাঁর রুশ বলে নিজেকে জাহির করাটা গভীর মনে হয়। জানি মারিয়া আর দেশে ফিরে যেতে চান না। কন্তু এখনকার যারা রুশ নাগরিক, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারাও যে আর কখনও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায় ।, সেটাও অনুধাবনযোগ্য তথ্য নয় কি?'

পারিবারিক জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, ছেলেবেলায় ও নাকি । জানে নি। এর তাৎপর্য প্রথমে বুঝি নি, তবে ওর কথাবার্তায় র্বদাই মায়ের উল্লেখ এবং পিতৃপ্রসঙ্গের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থেকে ানুমান করেছিলাম ওর মা স্বামিপরিত্যক্তা। সে অনুমান মিথ্যা হয় ।। সরবন্-এ তাত্‌য়ানার সুনাম ছিলো ভালো মেয়ে, পড়ুয়া মেয়ে হসেবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে লাইব্রেরী, রাতে লাইব্রেরী থেকে ফরে সটান বিছানা। বইয়ের জগৎ ছাড়া বিশেষ কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো না, একমাত্র অর্থডক্স গীর্জার পারিপার্শ্বিক বাদে। রোববার রাববার গীর্জায় যেতো, এমিগ্রে রুশ সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য ানারকম গীর্জাপরিচালিত সমাজকল্যাণসংস্থাতেও কাজ করেছে, বিশেষত শিশুবিভাগে। কলেজ ছুটি হলে স্কুলের শিশুদের ক্যাম্পিং-এ নিয়ে যেতো।

'আমার বয়স যখন আঠারো তখন একজন আফগান ছাত্রকে ামার ভালো লাগে। তুমি প্যারিসে গেলে তোমাকে ছবি দখাবো। অত্যন্ত সুপুরুষ, প্রিয়দর্শী ছিলো আমার আফগান। ব্যবহারে এবং আলাপেও মধুর। ওদের সমাজ আমাদের থেকে নেক আলাদা, সেখানে মেয়েদের স্থানও ভিন্নরকম। ও অবশ্য চ্চশিক্ষিত এবং রুচিসম্পন্ন ছিলো। তখন আমি পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম ব ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে চলে যেতে এবং ধর্মান্তর গ্রহণ করতে। কিন্তু

ওকে হঠাৎ দেশে ফিরে যেতে হোলো। ও এসেছিলো ওর সরকারের একটা বৃত্তি নিয়ে, ওর সামনে ছিলো কর্মজীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তখনই হঠাৎ স্থির হয়ে গেলো ওকে কূটনৈতিক জীবন বেছে নিতে হবে। কূটনৈতিক চাকরীতে বিদেশী মেয়ে বিয়ে করা যায় না আমাকে বিয়ে করতে হলে ওকে আফগানিস্তানের উজ্জ্বল কর্মজীবন সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে, হয়তো চাকরী খুঁজতে হবে ফ্রান্সে এসে ও ছিলো গভীর দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদে অনুপ্রেরিত আধুনিক যুবক আফগানিস্তানের দরকার ওর মত কর্মী ছেলের। ওকে দেশগঠনের কাজে থাকতে হবে। ও কি বিদেশে চলে আসবে, বিদেশের অন্নপ্রার্থী হবে, শুধু একজন মেয়ের জন্য? কোনো আফগান বোধহয় একজন মেয়ের জন্য এতটা করতে পারে না। আমার আফগানও আমা আর আফগানিস্তানের মধ্যে আফগানিস্তানকেই বেছে নিলো। আমাকে অনেক দিন মনে রেখেছিলো, চিঠি লিখতো। এখন ও বিয়ে করেছে, কূটনৈতিক জীবনে বিয়ে করাটা দরকার। এখনও আমাকে ও ভোলে নি। এখন ও আছে ওয়াশিংটনে, উচ্চপদে। আমি জানি আমি যদি কখনও আমেরিকা যাই, চাকরীবাকরী টাকাপয়সা কোনো ব্যাপারে মুশকিলে পড়ি, ও অকুণ্ঠভাবে আমাকে সাহায্য করবে।

'পুরো আট বছর আমি ওর প্রেমে নিবদ্ধ ছিলাম। আঠারো থেকে পঁচিশ, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ও প্যারিস ছেড়ে চলে যাবার পর বছরের পর বছর ওর চিন্তা মনের মধ্যে লালন করেছিলাম। আমিও প্রাচ্য কি না। আমার মা আরমানী। আমি তাই অর্ধেক রুশ অর্ধেক আরমানী। আমার সঙ্গে ওর বিশেষ যোগ ছিলো। ওর মত আমিও ছিলাম আধুনিক চিন্তায় অনুপ্রেরিত, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উৎসুক। তা ছাড়া সবাই বলে আমাকে নাকি মধ্যপ্রাচ্যের মেয়েদের

মত দেখতে, তুমিও বলো। লাইব্রেরীতে বই খুলে ঠায় বসে থাকতাম, ওর ধ্যান করতাম। ফরাসী যুবকরা আনাগোনা করতো, পাত্তা দিতাম না।

'এইভাবেই আট বছর কেটে গেলো। কখন দেখি উৎসাহী ফরাসী ছেলেদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ জমে গেছে। ছেলেটি আমার প্রতি অসম্ভব অনুরক্ত। এ আমার বয়সী, তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরধার ছাত্র। এখনও ছাত্র, চিরকালই থাকবে—আমার মতই। গবেষণার পর গবেষণা, তার ওপারেও গবেষণা। ওকে আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না—ও একটা রহস্য। কখনও কখনও মনে হয় ও আমার সঙ্গে ঝগড়া করতেই ভালোবাসে, কিন্তু আসলে ও প্রচণ্ড অভিমানী। জানো, ও আমাকে গত তিন-চার বছর জ্বালিয়ে খেয়েছে। ও জানে বন্ধুত্ব এবং মানবিক সঙ্গের ব্যাপারে আমি ওর উপর নির্ভরশীল, ওকে ছাড়া আমার চলে না। সর্ববিষয়ে ও-ই আমাকে সাহায্য করে, কি মস্কো যুব-উৎসবে যাবার অনুমতি পেতে, কি প্যারিসে চাকরী জোগাড় করতে, কি ইংলণ্ডে চাকরীর জন্য দরখাস্ত লিখতে। আমাদের পরিবারের সাংসারিক সবরকম ব্যাপারেই ওর সাহায্য পেয়েছি। আমাদের বাড়িতে আসে, মা ওকে খুবই পছন্দ করেন। মা চান আমি ওকে বিয়ে করি। ও বহুবার বলেছে। এই ইংলণ্ডে আসবার আগেও। আমি ওকে বলেছি আমাকে আরও দু'বছর সময় দিতে। তুমি জানো, ওকে বিয়ে করবো কি করবো না, এ কথা ভেবে ভেবেই আমার পেট ব্যথাটা হয়েছে? ও যে জানে ওকে ছাড়া আমার চলে না—আমার আর কোনো ভালো বন্ধু নেই। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে যে উৎসাহ পাই না। তাতে ওর কি কম অভিমান? ও দারুণ কথা বলতে পারে—ওর কথার জালে জালে আষ্টেপৃষ্ঠে ও আমাকে বেঁধে

ফেলে, আমি নিশ্বাস ফেলতে পারি না। নিভৃতে এক বছর চিন্তা করার জন্যই আমি অক্সফোর্ডে এসেছি। প্যারিসে ওর আওতায় ওর সম্পর্কেই কি করে স্বাধীন চিন্তা করবো বলো? কিন্তু এখানেও ওর প্রভাব। সমানে উপহার পাঠাচ্ছে, পাঠাচ্ছে চিঠি। সেদিন একটা চিঠি পেলাম— লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে অমুক দিন অমুক সময়ে উপস্থিত থেকো। যখন চিঠি পেলাম তখন সে তারিখ পার হয়ে গেছে। বেচারী ইংলণ্ড এসে ঘুরে গেছে আমাকে না পেয়ে।

'গত টার্মে টেইলরিয়ানে ছেলেমেয়েদের রুশ নাটকের মহড়ার ব্যাপারে এক ইংরেজ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমার চাইতে দু'-এক বছরের বড় হবে। খুব বুদ্ধি, জীবনযাত্রায় বোহেমিয়ান। ওর মাথার সামনের দিকটাতে একটু টাকের মত আছে—এলিজাবিথান ছবিটবিতে যেরকম দেখা যায় না? ওকে খানিকটা ঐরকমই দেখতে। হেসো না, খানিকটা শেক্সপীয়রের প্রচলিত মূর্তির মত। এই ছাখো ছবি, কেমন, ঠিক না?'

সত্যিই অবাক হলাম। গ্রীনরুমে একরাশ ছেলেমেয়ের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবক, ঠিক যেমন ছবিতে থাকে শেক্সপীয়র এক কোণ থেকে দেখছেন মেরী ওয়াইভ্‌স্ অব উইণ্ডসরের প্রথম অভিনয়। 'ওকে প্রথম প্রথম আমি সুদর্শন মনে করতাম না। প্রথমে বিশেষ আকৃষ্ট হই নি। যখন ইংরেজী কায়দায় চা-কফি খেতে বা থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইতো, খুব একটা আগ্রহ দেখাতাম না। কিন্তু রিহার্সালের ব্যাপারে ক্রমশই বুঝলাম রুশ আর ফরাসী এই দুই ভাষা আর সাহিত্যের উপর কি দারুণ ওর দখল। দেখলাম কি সূক্ষ্ম ওর বিচারবোধ। আমার সঙ্গে ও যে বিশুদ্ধ ফরাসীতে কথা বলে তা একজন ইংরেজের পক্ষে অভাবনীয়। প্যারিস ওর অসম্ভব ভালো

লাগে। আমাদের নানান সাধারণ কৌতূহল ছিলো, তারই মাধ্যমে পরিচয় দৃঢ় হোলো। প্রথম টার্মের শেষের দিকে আমি তো প্রায়ই টেইলরিয়ান থেকে বেরিয়ে ওর সঙ্গে উইম্পি বারে লাঞ্চ খেতাম। নিশ্চয় মনে আছে, তোমরা মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি তুপুরে খেতে ফিরি নি কেন, আর আমি বলতাম বাইরে খেয়ে নিয়েছি? উইম্পি বারে তোমরা খাও না কেন? কি সস্তা! একবার খেয়ে দেখো। যাই হোক, যা বলছিলাম, ওর সঙ্গে ক্রমশ আমি এত ঘুরতে শুরু করলাম যে আমার ছাত্ররা তো বটেই, রুশ বিভাগের প্রোফেসাররাও তা লক্ষ্য করলেন। কেনাকাটা করতে হলে ও আমাকে দোকানে নিয়ে যেতো। অপেরায় নিয়ে যেতো। নিয়ে যেতো বাড়িতে কফি খেতে, অক্সফোর্ডের একটু বাইরে। আমিও ওকে তু' একদিন কফি খাইয়েছি। এই হুইস্কি তো ওর জন্যই কিনেছিলাম। তখন যদি আইরিশ কফি বানাতে জানতাম, ওকে ঠিক করে দিতাম! মারিয়ার সঙ্গে গণ্ডগোল বাধবার পর এই নতুন ঘর খুঁজে দিতে ও-ই তো আমাকে সাহায্য করলো। ওর উপর ভরসা করেই তো হঠাৎ অমন করে নোটিশ দিতে পেরেছিলাম। আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। এখন তো আমার চোখে ও দারুণ সুপুরুষ। ও বলেছিলো ছুটিতে ও প্যারিসে যাবে, তু'জনে অনেক বেড়াবো এরকম স্বপ্ন দেখে-ছিলাম। কিন্তু এক সন্ধ্যায় একটা পার্টির পর ওর বাড়িতে ও যেন বড্ড নেশাগ্রস্তের মত আচরণ করতে লাগলো। মদের নেশার কথা বলছি না। এ হোলো আধুনিক যুবকদের ইচ্ছাকৃত বোহিমিয়ান নেশা। আমাকে একটা সোফায় বসিয়ে ও বসলো আমার পায়ের কাছে, কার্পেটে। ও বললো ও বুঝতে পেরেছে আমি ওর প্রেমে পড়েছি। কিন্তু ও নাকি কাউকেই ভালোবাসতে পারে না। ওর টেবিলের উপর

:গোটা দুই রূপসী মেয়ের ফোটোগ্রাফ ছিলো, অনুমান করি ওর প্রথম যৌবনে ও কিছু ঘা খেয়েছে। লক্ষ্য করেছিলাম মেয়েদের ভালোবাসা সম্পর্কে ও একটা সীনিকাল মত পোষণ করতো। সন্দেহ করি, ওর প্রথম অভিজ্ঞতাগুলোকে এখন ও স্বেচ্ছাচারের অজুহাতে পরিণত করেছে। নইলে ওর জীবন থেকে ভালোবাসা কেন শুকিয়ে যাবে? ও আমাকে বললো, ও চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু ও আর কোনো মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে না। অথচ জৈব আকর্ষণ ঠিকই অনুভব করে! ও আমাকে বললো ওর সঙ্গিনী হতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কত দিনের জন্য? ও বললো, এক বছর, দু'বছর, যত দিন ভালো লাগা টেকে। হয়তো তার মধ্য থেকেই ভালোবাসার সূত্রপাত হবে। যখন কথা বলছিলাম তখন রাত বেশ হবে। একটি ইংরেজ মেয়ে—বৌটনিক ছাত্রী—ওর সঙ্গে দেখা করতে এলো। ও মেয়েটিকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে কি যেন বললো, মেয়েটি চলে গেলো। হয়তো মেয়েটিকে বলেছিলো, আজকে হবে না। সেই মুহূর্তের মধ্যেই আমি আকাশ-পাতাল একসঙ্গে ভেবে নিলাম। ওর প্রস্তাবে আমি রাজী হই নি।'

'বেশ করেছো', বলে উঠি আমি।

'কিন্তু ঠিক করেছি কি সত্যি? এখনও যে ওকে ভুলতে পারি না। আমিও আকৃষ্ট হয়েছিলাম তো। মনে হয়, কি জানি, হয়তো আনন্দের সুযোগ আমার হাতে এসেছিলো, আমি না জেনে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি কি শুধু সংসারের পুতুল হয়ে গেলাম? হয়তো সত্যিই সান্নিধ্য থেকে প্রীতির উৎপত্তি হোতো? হয়তো আমি ওকে বোহিমিয়ান জীবন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। রাজ্যের বোকা বোকা মেয়ের সঙ্গে মেশে আজকাল, যারা ওকে মোটেই বোঝে না। এই তো সেদিন দেখলাম মোমের পুতুলের মত এক দোকানদারনী মেয়েকে

লণ্ডন থেকে তুলে এনেছে কোনো এক পার্টির জন্য। কষ্ট হয়। জানো ও কী অবাক হয়েছিলো আমি উনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কুমারী আছি শুনে?'

'শয়তান!'

'তুমি তো বলবেই। তোমাদের ঐতিহ্য আলাদা। আমাদের ইয়োরোপীয় সমাজ সেরকম নয়। আমি তো এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। ইংলণ্ড-ফ্রান্সে কি দেখছো? ফ্রান্সে তো আধুনিক যুবক-যুবতীরা সম্পূর্ণই বৈষয়িক কারণে বিয়ে-থা করে। প্রেমে পড়া তো পুরোনো হয়ে গেছে। আমি বাড়ির শিক্ষাদীক্ষায় রুশ-আরমানী কি না, আমি তাই আজকাল প্রাচীনপন্থী হয়ে গেছি।' হেসে ওঠে তাত্য়ানা।

'তুমি ঠিকই করেছো', বলি আমি, 'ওভাবে আত্মোৎসর্গ করে কোনো স্বেচ্ছাচারী যুবককে সৎপথে আনার কোনো অর্থ হয় না। ইট ইজ নট ওয়র্থ ইট। বিশেষত সে যখন স্নেহে অক্ষম এবং সে কথা রূঢ়-ভাবে মুখের উপরেই বলে দিচ্ছে।'

'ঠিক, ঠিক, আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম সে কথায়। আর কি মাতব্বর জানো? আমাকে বোঝালো আমি নাকি "ভিন্ন ধরনের" মেয়ে, ভালো মেয়ে। আমার কাছ থেকে ওর সরে যাওয়াই ভালো। আমি নাকি "সীরিয়াস" মেয়ে, আমি ওকে বাধ্য করি চিন্তা করতে—যেটা সে নিতান্ত অপছন্দ করে—এবং আমার মত মেয়েকে তলিয়ে দেখবার মত অপর্যাপ্ত সময় ওর নেই। ছোটখাট অ্যাফেয়ারেই ও তৃপ্ত। সুতরাং আর কেন। তাই ও একেবারে সেদিন থেকেই আমাকে নির্মমভাবে ত্যাগ করে গেছে। মুখে বলে গেছে কায়দাদুরস্ত ভদ্রতায়, মধ্যে মধ্যে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এখনও আছে অক্সফোর্ডে, আসে টেইলরিয়ানে। কিন্তু লাঞ্চ খেতে যায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে হইচই

করতে করতে, মাদমোয়াজেল আন্তনভকে আর ডাকে না। একদিন দেখেছিলাম কর্নমার্কেট স্ট্রীটে, একটি ইংরেজ মেয়ের বাহুলগ্ন হয়ে উল-ওয়র্থ ক্যাফেটেরিয়ায় যাচ্ছে। আমিও খেতে বেরিয়েছি। দেখা হলে একসঙ্গে খেতে যাওয়া জানোই তো অক্সফোর্ডের বাঁধাধরা নিয়ম। ও কিন্তু অনেক মৌখিক ভদ্রতা করলো, অথচ একবার জিজ্ঞাসা করলো না, কী, কোথায় খেতে যাচ্ছো, আমাদের সঙ্গে এসো না! প্রথম টার্মে যারা যাবা আমাদের একত্র দেখেছিলো তারা সবাই না জানি কি ভাবে। আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারি না। রুশ সেমিনারের প্রোফেসারেরা কি ভাবেন কে জানে। হয়তো অবলিয়েনস্কি এবং দ্রজ্‌দভেরও কানে যাবে, প্যারিস পর্যন্তও পৌছবে। ও ছুটিতে ঠিকই প্যারিসে গিয়েছিলো। আমার ঠিকানা ফোন নম্বর সবই ছিলো ওর কাছে। একবারও দেখা করে নি।'

পরীক্ষার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাত্‌য়ানাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কাজও করতে থাকি। মাঝখানে ইস্টারের ছুটিতে ও আরেকবার প্যারিস ঘুরে এলো। তার পর এলো শেষ টার্ম, তথাকথিত গ্রীষ্মের টার্ম। এ সময়ে বিভিন্ন কলেজে নৃত্যোৎসব হয়। ইংরেজ বান্ধব খোয়া যাওয়ায় তাত্‌য়ানা যোগদানের আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। অথচ দারুণ কৌতূহল আব আগ্রহ ছিলো। ওর ধারণা, আগেকার দিনের মত এখনও রোম্যান্টিক আছে ব্যাপারটা। ভাবলাম, ধারণাটা ভাঙার জন্যও ওর যাওয়া দরকার। সঙ্গী জুটে গেলো। বেলিয়ল কলেজের নৃত্যোৎসব উপলক্ষ্যে একজন শ্যামদেশীয় ছাত্র খর্বাঙ্গী সঙ্গিনী খুঁজছিলো, ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে জুটছিলো না। তাত্‌য়ানাকে স্নান-প্রসাধন করিয়ে লম্বা সাদা পোশাকে পাঠিয়ে দিলাম। সারা রাত জাগবার জন্য তৈরী থাকলেও রাত দু'টোর মধ্যেই ও ফিরে এসেছিলো। শুধুই

নাকি টুইস্টের মাতামাতি ; তা ছাড়া ছেলেটিও কাঠখোট্টা, প্রাচ্য ছেলেরা সাধারণত যেরকম নম্রমধুর হয় মোটেও সেরকম নয়।

'ব্যাড্ লাক্, তাত্য়ানা!' বলি আমি

এক এক দিন রাত দশটার পর আমরা দুজনে বেরোতাম নৈশ বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে। হয় ব্যানবেরী নয় উডস্টক রোড ধরে। আমাদের অন্য উদ্দেশ্য—প্রকাশ্যে অস্বীকৃত—ছিলো ফুল তোলা। আমাদের মতে এটা মোটেই চুরির পর্যায়ে পড়তো না, কারণ আমরা শুধু তুলতাম বড় বড় গাছের ফুটপাথপ্রসারী শাখা থেকে বিলম্বিত মঞ্জরী। গৃহস্থবাড়ির গাছের ডালপালা যদি ঋতুর গুণে স্ফীত হয়ে ফুটপাথের উপর অকৃপণভাবে নত হয়ে পড়ে, ঝুলিয়ে দেয় তার পল্লবিত বল্লী, থরে থরে বাড়িয়ে দেয় তার পুষ্পরাশি, তাহলে আমরাও কি অকুণ্ঠিত হস্তে সে অমৃতদানের অংশ গ্রহণ করবো না ? অত রাত্রে ডালপালা ফুলপাতা হাতে দুটি মেয়েকে হাঁটতে দেখলে ইংরেজরা অবশ্য ঠিকই ফিরে তাকাতো, আমরা তখন চোরাই মাল লুকানোর চেষ্টা করতাম। কখনও বা দূরে গাড়ি দেখলে পুলিসের গাড়ি ভেবে সটান কোনো গলিতে ঢুকে পড়তাম। সে অনুমান কয়েকবার সত্য হয়েছিলোও। একরকম ঝুলন্ত হলুদ ফুল আমাদের খুব প্রিয় ছিলো, সেটা কিন্তু ফুলদানীতে মোটেই থাকতো না, পরদিন সকালেই বিশীর্ণ হয়ে যেতো। কিন্তু দু' একদিন আমরা করতাম সত্যিকারের অপহরণ সেটা হোলো হাউজ থেকে। আমাদের বাগানে এক জোড়া মনো-মুগ্ধকর লাইলাক গাছ ছিলো, তাদের ফুলের বর্ণ আর ঘ্রাণ দুইই ছিলো আমাদের দু'জনকার বিশেষ প্রিয়। মারিয়ার ভয়ে দিনের বেলা কখনও সে-গাছ ছুঁতে সাহস পেতাম না। রাত এগারোটায় আসতো চয়নের সুবর্ণসুযোগ। তারপর বাগানের দরজায় আমি তাত্য়ানাকে গুড-

াইট জানাতাম, সেও দ্রুত পদক্ষেপে গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতো।

পরীক্ষার সময় তাত্য়ানা আমাকে অনেক সাহায্য করলো। য়লিৎসা থাকলে যেমন করতো। মারিয়া দেখতে লাগলেন হরদমই াতয়ানা আমার কাছে যাতায়াত করছে, আমার জন্য বাজার রে আনছে, কিনে আনছে রাশি রাশি ফল। বাসন ধুয়ে দিচ্ছে, াবার জায়গা করে ডাক দিচ্ছে। একদিন আমার ঘরে এসে দেখেন াত্য়ানা আমার বিছানা করছে, আমি পড়ছি, অন্য একদিন, আমি থারীতি পড়ছি, আর শ্রীমতী আস্তনভ নিবিষ্ট মনে আমার একটা রোনো শায়া মেরামত করছে।

পরীক্ষার সপ্তাহে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আসতো আমার খোঁজ নিতে। রীক্ষার মাঝামাঝি এক শনিবার বিকেলে হাউজে যথারীতি গ্রীষ্ম-ালীন উদ্যান-পার্টির আয়োজন হোলো। আমি জোর করে াত্য়ানাকে আমার অতিথি আনলাম। মারিয়া নির্বাক। ডাঃ জ্‌দভ আমাকে যেখানে যেখানে 'এই যে আমাদের ভারতীয় মেয়ে' লে টেনে নিয়ে যান আমিও সেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যাই াত্য়ানাকে, 'আমার প্যারিসের বান্ধবী' বলে। বাড়ির ছেলেরা াত্য়ানাকে সবাই পছন্দ করতো। এডওয়র্ড আমাদের নাসপাতি াছের নিচে ডেকে চুপি চুপি বললে, 'এই টেবিলেই আছে মারিয়ার হস্তে প্রস্তুত পাঞ্চ, অতি মনোরম। কিন্তু মারিয়ার উদ্দেশ্য সবাইকে বশি করে চা খাইয়ে পেট ভরানো, যাতে পাঞ্চ কম খরচ হয়। তামাদের দেখিয়ে দিলাম, যত খুশি গেলাস ভর্তি করে খাবে। নইলে মার ফুর্তি কি? যত সব—।' আমরা বিনা দ্বিধায় এডওয়র্ডের াতুপদেশের সদ্ব্যবহার করলাম।

তাত্য়ানা দিব্যি দিয়ে বলে গেলো আমার জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেলেই প্যারিসে চলে আসতে। ও আগেই লিখে রেখেছে মাকে প্রতিবেশীরা অপেক্ষা করে আছে আগ্রহ নিয়ে। পরীক্ষার পরই তাত্যানার সঙ্গে কেন চলে আসছি না, জানতে চাইছেন মাদাম আস্তনভ। তাত্য়ানা মাকে বুঝিয়েছে, ভারতবর্ষে ফিরে যাবে, কিন্তু প্যাকিং অন্তত করে আসতে হবে তো।

'আমাদের বাড়ি অবশ্য যাচ্ছেতাই, তোমাকে আরামে মোটেও রাখতে পারবো না। না জানি তুমি কি ভাববে। তুমি ভারতীয় দারিদ্র্য অনেক দেখেছো, সে ভেবেই অনেক সাহস করে নেমন্তন্ন করছি। আমাদের অবস্থা দেখে হেসো না কিন্তু।'

আমি হেসে বললাম, 'তাত্য়ানা, বিনা খরচায় প্যারিসে থাকতে পারলে লোকে কী কষ্ট না সহ্য করতে রাজী হয়। তুমি না ডাকলে আমি প্যারিসে আর যেতামও না। এখন সুযোগ দিচ্ছো, ছাড়বো না। আমি কার্পেটে শুতে পেলেই সন্তুষ্ট।'

'না না, একটা বিছানা তুমি পাবে। তবে খিদে পাবে তোমার অর্ধভুক্ত থাকবে। আমাদের বাড়িতে রান্নার পাট বিশেষ নেই আমরা সব অনাহারা! আমি কিছু মশলা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এসে ভালো-ভালাই তোমাদের হলদে-লাল ঝোল রান্নাবান্না কোরো।'

হাসিমুখে বিদায় নিলাম আমরা।

॥ তিন ॥

এর আগে প্যারিসে আমি কখনও রাত কাটাই নি। সুইটজার-ল্যাণ্ড ভ্রমণের সময় একবার যাবার পথে আর একবার ফেরার পথে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মার্কিনী কায়দায় সফর করেছিলাম। আমার সঙ্গে যে ভারতীয় মেয়েটি ছিলো সে আগে প্যারিস ঘুরে গেছে, সে স-ফাঁকেই আমাকে লুভ্‌র, ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের গ্যালারী, শাঁজেলিজে, বোয়া দ্য বুলনের বাইরের দিক, তুর ইফেল বা আইফিল টাওয়ার এবং প্লাস দ্য লা কঁকর্দ দেখিয়ে দিয়েছিলো। আমি ক্ষণে ক্ষণেই পুলকিত বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে সফরের গতি ব্যাহত করে দিচ্ছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে, খুব দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে একটি রাস্তার দু'পাশে বাড়ির বৈশিষ্ট্য আমাকে আকর্ষণ করছিলো, হঠাৎ চোখে পড়লো রাস্তার নাম—রু স্যাঁত্‌ অনরে। আমি অভিভূত হয়ে বলে উঠলাম, 'আমরা রু স্যাঁত্‌ অনরে দিয়ে হাঁটছি!' আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গিনী আমার এই ব্যাকুলতায় বিব্রত বোধ করতে লাগলো, এরকম করতে থাকলে আসল দ্রষ্টব্যগুলোই দেখা হবে না। কিন্তু যে রু স্যাঁত্‌ অনরের নাম মন্ত্রের মত এতবার শুনেছি, এতবার বইয়ের পাতায় দেখেছি, তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে এক মিনিটও কি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবো না?

এবারও প্যারিস গেলাম চেনা পথে: স্কাইওয়েজ্‌ এয়ার-কোচ লণ্ডন-প্যারিস। সব থেকে সস্তা পড়ে। কিন্তু প্রচণ্ড হয়রানি। বাসেই

যাত্রা আগাগোড়া, শুধু মৌমাছির মত ছোট্ট একটি প্লেন এসে সমুদ্র
পার করিয়ে দেয়। বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছলাম প্লাস দ্য লা
রেপুব্লিকে, স্কাইওয়েজের টার্মিনালে। তাত্য়ানা হাজির, দারুণ
খুশী আমাকে দেখে। প্রথমে আমরা সংলগ্ন উন্মুক্ত ক্যাফেতে কফি
খেলাম, আমি গরম গরম, আর তাত্য়ানা গরম কাপকে নাতি
শীতোষ্ণ করে। নাঃ, ওকে আর কফি পানে অভিজাত করা গেলো
না। তারপর বাড়ি। তাত্য়ানা প্যারিস শহরের উপরে থাকতো
না, থাকতো প্যারিসের উপকণ্ঠবর্তী এক শহরে, নাম মার্দ।
প্যারিসের শহরতলি অঞ্চল। মেট্রো অর্থাৎ মাটির নিচের রেলপথে
মেয়রী দিসি পর্যন্ত, সেখান থেকে বাস। নামতে হোতো যে স্টপে
তার নাম শর্ম্যাঁ দে ভিন্ অর্থাৎ দ্রাক্ষাবীথি। দ্রাক্ষাকুঞ্জের চিহ্নমাত্র
আজ আর নেই, আছে শহরতলির শুকনো শক্ত রাস্তা। কিন্তু এক
সময় আঙুর আর মদের জন্য বিখ্যাত ছিলো এই অঞ্চল।

বাস থেকে নেমেই বুঝলাম মার্দ একটু উঁচু জমির উপর, নিচে
গোটা প্যারিস শহরটা দেখা যাচ্ছে। আইফিল টাওয়ার এবং সেইন
নদীর উপরে সাঁকোগুলি সহজেই নজরে পড়ে। কিছুদূর অগ্রসর
হয়েই তাত্য়ানা একটা গলির ভিতর দিয়ে শর্টকাট নিলো। গলিটা
দেখে অবাক হলাম। এদিক ওদিক পুরোনো কাগজ, কাপড়ের ছেঁড়া
টুকরো, সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। বৃষ্টিতে সেগুলি এবড়ো
খেবড়ো কাদামাটি আর পাথরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। বুঝলাম এ
গলিটাতে কোনো দিন ঝাঁট পড়ে না। যে যেখানে কাগজ ফেলেছে
সেটা সেখানেই শুয়ে আছে শিলীভবন বা দ্রবীভবনের অপেক্ষায়
অনন্ত শয্যায়। দেশ ছাড়বার পর এই প্রথম এ ধরনের রাস্তা চোখে
পড়লো। গলির পরেই অবশ্য আবার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, গলিটা সত্যি

নিয়মের ব্যতিক্রম। ডান হাত বাঁ হাত কয়েকবার মোড় নি
অবশেষে তাত্য়ানা আমাকে যে দরজার সামনে এনে উপস্থি
করলো, সেটা যে কোনো গৃহস্থবাড়িব সম্মুখভাগ তা ভাবে
পারি নি। দেখতে খানিকটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ির গ্যারাজের মত
কাঠের উপর আধময়লা কালো-রঙ-করা। ঢুকবার আগে তাত্য়া
সাবধান করে দিলো, 'হেসো না কিন্তু, এটাই আমাদের বাড়ি। জা
বাড়ি বলা চলে না একে।' আমি ওকে নিশ্চিন্ত হতে বলে উঠা
ঢুকে পড়লাম। বাঁ দিকে তালা-বন্ধ একটি দরজা, ডান দিকে টি
বেড়া, আগাছা, দড়িতে ঝুলছে কাচা কাপড়; ছাউনি-দেওয়া এ
পাশে একটা আটচালা, সেখানে একটা বিরাট পরিত্যক্ত ধূলি-ধূসরি
মোটরগাড়ি।

এক রাশ মিষ্টি হাসি মুখে নিয়ে ছুটে এলেন মাদাম আস্তনভ
ছোটখাট গড়ন, বয়স সত্ত্বেও মুখে একটা মন-ভোলানো লাবণ্যে
ছাপ। হাসিটি খাঁটি এবং সরল। দেখেই বোঝা যায় তাত্য়ানার ম
আকারে-প্রকারে এক। শুধু একজনের শরীরে, চোখের নি
কপালে পড়েছে প্রৌঢ়ত্বের অঙ্গুলিস্পর্শ। মেয়ে এখনও তন্বী, মা
অনুপাতে একটু মোটা হয়ে পড়েছেন। 'আঁশাতে, আঁশাতে', অর্থ
'তোমাকে দেখে মুগ্ধ হলাম।'

বাড়িতে ঢুকতেই একটি জীর্ণ ঘরে একটি ঝকঝকে নতুন বেসি
এবং ঝরণা-বসানো বাথটব। টেবিলের নিচে গ্যাসের সিলিণ্ড
রয়েছে, তার সাহায্যে জল গরম হচ্ছে। বুঝলাম, এ বাড়িতে আ
আদৌ এ-সব ছিলো না, ওঁরাই কোনোমতে ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছে
তার পরের ঘরে একটি টেবিল পাতা, কয়েকটি বিশুষ্ক চেয়ার, দেয়ালে
গায়ে ধূলিমলিন তাকে অজস্র রুশ বই, আরমানী পোশাকে কিশো

াত্য়ানার একটি বাঁধানো ফোটো, কাচের আলমারিতে কিছু
াসনপত্র সাজানো। তার পরে আরও একটি ঘর, এখানে বিগত
াতাব্দীর একটি জরাগ্রস্ত সোফা, একটি অর্ধমৃত পিয়ানো এবং একটি
াকঝকে টেলিফোন। দেয়ালে তাত্য়ানা আর তার দু'-ভায়ের একত্র
াল্যকালীন ছবি, জায়গায় জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে। এর পর একটি
ঘরা বারান্দার মত, একদিকে উঠে গেছে দোতলায় যাবার ঘোরানো
াঠের সিঁড়ি, অন্যদিকে রান্নাঘরের দরজা। রান্নাঘরটি ছোট, কিন্তু
ারই মধ্যে পরিচ্ছন্ন। একটি দু'-মুখ-ওয়ালা বিজলী উনুন, বেসিনের
লে শুধু ঠাণ্ডা জল। জানলার তাকে দুটি ইয়া বড় বড় টোমাটো
রাদ পোহাচ্ছে, টোমাটোদের পাশে ঘুমোচ্ছে একটি পুষ্ট বিড়াল।
ান্নাঘরের পাশে মাদাম আস্তনভের শোবার ঘর, সেখানে বাঁধা
য়েছে জিজি আর বুদা কুকুরদ্বয়, আমাকে দেখে অত্যন্ত উৎসাহভরে
াগত জানাতে লাগলো। কিংবা ভৌ-ভৌ রবে জিজ্ঞাসা করতে
াগলো, 'কে তুমি, কেন এসেছো?' মাদামের বিছানার চাদর তাদের
ত লোমে সমাচ্ছন্ন, সারা ঘরে একটা কুকুর কুকুর গন্ধ। এক পাশে
াকটা রেডিও, একটা ড্রেসিং টেবিলের উপর কয়েকটি ম্লান পারিবারিক
ফাটো—তাঁর ছেলেমেয়েদের। তাছাড়া চিরুনি, এসেন্সের শিশি,
ঠির কাগজপত্র। কুলুঙ্গিতে খ্রীষ্টমূর্তি, সামনে ঝুলন্ত শুকনো মালা,
য়ালে মার্কামারা ক্যালেণ্ডার, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জামা-কাপড় ও
ত্র-পত্রিকা। এক কোণে কাপড়-চোপড়ের আলমারি। নড়বড়ে
াকটা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পিছনের উঠান—একেবারে পথের
াচালীর অপু-দুর্গার উঠানের মত। বৃষ্টিম্লান ভাঙা বেঞ্চি, অজস্র
াগাছা, ছেঁড়া অয়েলক্লথের মাদুর, অযত্নবর্ধিত ঘাস। তারই
াকে দু-একটি গ্যাঁদা-জাতীয় ফুল, উপুড়-করা টবে ঢাকা শিশু চারা।

একটি রোদবৃষ্টির আশীর্বাদে ভরা টেবিলও রয়েছে লক্ষ্য করলাম। বলাই বাহুল্য, তার আর পালিশ বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই।

'চলো, তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই', বলে তাত্য়ানা ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা পৌঁছই 'দোতলায়'। আসলে এ হোলো অ্যাটিক বা চিলেকোঠা। 'এটা হোলো আমার ঘর, তুমি এখানে থাকবে।'

বুঝতে পারলাম কোনোমতে কাজ সারার উদ্দেশ্যেই এই ঘর ব্যবহৃত হয়। মূর্তিমতী শ্রীহীনতা বিরাজ করছে। মলিন দারিদ্র্য শতহস্তে তার ছাপ রেখেছে। বিরাট বিরাট জানলার কাচ-ভাঙা শার্সি, খুলে-পড়া কাঠের পাল্লা, পর্দার বালাই নেই। দেয়ালের চুন-বালি খসে পড়ছে, জায়গায় জায়গায় লোনা ধরে বড় বড় দাগ হয়ে আছে, প্রাচীন কাগজ ঝুলে আছে কোনো কোনো কোণায়। গতসৌষ্ঠব মেঝে। এরই মধ্যে জীবনধারণের সরঞ্জাম অপরিচ্ছন্নভাবে বিক্ষিপ্ত একটি পুরোনো ড্রেসিং-টেবিল, একটি স্প্রিং-এর খাট, একটি আধুনিক টেবিল, আরেকটি লেখার ডেস্ক, দেয়ালের গা ঘেঁষে বইয়ের তাক, তা ছাড়া কুলুঙ্গি-বোঝাই বই। টেবিলবাতির নিচে রাশ রাশ চিঠি, সুদৃশ্য চিঠি লেখার কাগজ, রুশ ও ফরাসী কাব্যগ্রন্থ, ক্ল্যাসিকাল আর্টের দুর্মূল্য সচিত্র গ্রন্থ, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিষয়ক অসংখ্য পত্রিকা, গ্রাফপেপার, ফাইল। বিছানার উপর একটি নীল-রূপালী রঙের ট্রানজিস্টার, তাত্য়ানার কোনো এক নীরব ভক্তের প্রীতি-উপহার। একটি ভাঙা বেতের চেয়ারের উপর সাদা পশমের ছোট গালিচা, তার উপর তাত্য়ানার সদ্যক্রীত টেলেফুংকেন রেকর্ড-প্লেয়ার। মেঝের উপর কার্ডবোর্ডের বাক্সে রেকর্ড : বাখের ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ কনচের্টো, ভিভাল্দির দি ফোর সীজন্স্, স্পেনীয় গীটারের একটি

তুন-বার-করা রেকর্ড (তাত্য়ানার কোন এক ছাত্রের উপদেশ-
নুসারে কেনা), মুসর্গস্কির অপেরা বরিস গডুনভ তিন খণ্ডে,
াভিনস্কির ব্যালে পেত্রুশ্কা স্বয়ং স্ত্রাভিনস্কি কর্তৃক পরিচালিত, আর
জস্র আটাত্তর-স্পীডের রুশ লোকসংগীত, এগুলি মস্কোয় কেনা।
ছানার শিয়রে একটি বর্ষম্লান ফোটোগ্রাফ, একটি স্মিতমুখ
াবণ্যময়ী কিশোরীর। না, তাত্য়ানার নয়, তার মায়ের, এবং মাদাম
াস্তনভরূপে নয়, সপ্তদশী আরমানী সুন্দরী আরাক্সী নার্সিসিয়েন
িসাবে। আশ্চর্য, চেনা যায় এক নজরেই। একই মুখ, এখন শুধু
প্রৌঢ়ত্বের কিছু অবশ্যম্ভাবী চিহ্ন পড়েছে। হাসিটুকু আছে অপরি-
র্তিত। কালের গ্রাস থেকে স্নেহময়ী মায়ের মুমূর্ষু ছবিটিকে সযত্নে
ক্ষা করেছে পিতৃপরিত্যক্তা কন্যা।

ঘরের এক কোণে একটি জিনিস নজরে পড়লো। কাঠের একটি
হলানো বোর্ড। তার গায়ে পিন দিয়ে আটকানো গোটা পঞ্চাশেক
বিওয়ালা পোস্টকার্ড—পারসীক আর ভারতীয় 'মিনিয়েচার' চিত্র-
লার নিদর্শন। চোখে পড়লো পাখি-হাতে সুলতানাদের পরিচিত
ঙ্গি, ফার্সী হরফে লেখা উদ্ধৃতি। তাত্য়ানার জীবনের আফগান
র্যায়ের উত্তরাধিকার।

মাদাম আস্তনভ নিচে থেকে তাড়া দিলেন। তাড়াতাড়ি হাতমুখ
য়ে দুপুরের খাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। প্রথম দিন অতিথি-
াপ্যায়নের জন্য সাধ্যমত আয়োজন করেছেন ভদ্রমহিলা। টক
াঁধাকপির সূপ, মাংস, এক রাশ নিপুণ হস্তে প্রস্তুত স্যালাড। আমি
ওনা হয়েছি সেই কোন ভোরে—আমার সবই অমৃতের মত মনে
তে লাগলো। মাদাম বার বারই আয়োজনের স্বল্পতার জন্য দুঃ
প্রকাশ করতে লাগলেন, আমি প্রতিবাদ করতে থাকলাম। হঠাৎ

তাত্য়ানার খেয়াল হোলো: 'সে কি, প্যারিসে এসেছে, আসল জিনিসই তো দেওয়া হয় নি!' দ্রুত উঠে গিয়ে একটা বড় কালচে-সবু রঙের বোতল নিয়ে এলো। ঢক ঢক শব্দে গেলাসে ঢাললো। স্প করে মনে হোলো এর থেকে ভালো লাল দ্রাক্ষানির্যাস আমি ইংলে পান করেছি। বোতলটার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, দেখলাম লেবেল হীন। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাতয়ানা, এ কো কোম্পানী?' তাত্য়ানা হেসে বললো, 'আর বোলো না, এই তে সামনের আরমানী দোকানের মাল, খুবই সাধারণ, এ কিছুই না, এ কিছুই না, এ গরীবখানার অভ্যর্থনা।' আমি বললাম, 'আমি অত সমঝদার নই, আমার সাধারণ জিনিসেই পরিতৃপ্তি, তবে খুচরো কি করে কিনলে?'

—'এ দোকানে খুচরো পাওয়া যায়, ঢেলে দেয়।'

—'দেখো বাবা, সন্দেহজনক, কেরোসিনের বোতল মনে হচ্ছে।' সশব্দে হেসে ওঠেন দুজনেই—

—'না না, ভেবো না, পরিষ্কার, আমাদেরই পুরোনো বোতল।'

হঠাৎ মাদাম্ আস্তনভ ভুরু তুলে প্রশ্ন করেন, 'ওকে সেটা দেবে নাকি?'

—'হ্যাঁ মা, দিতে পারো, ওর বোধহয় ভালোই লাগবে। ওর খুব পছন্দ ও ধরনের জিনিস। মশলা দেওয়া তো।'

তাত্য়ানা উঠে গেলো এবং কাগজে-মোড়ানো কি যেন নিয়ে এলো। জিনিসটা কি ভাবছিলাম। সংরক্ষিত মাংস। সসেজ বা সালামী নয়। মাংসের আমসত্ত্ব বললে বোধহয় খানিকটা বর্ণনা দেওয়া হয়। মশলার সুগন্ধ বেরোচ্ছে। 'সামনের আরমানী দোকানের', বলে তাত্য়ানা, 'খাও, কিছু হবে না!' খেয়ে দেখলাম, সত্যিই অপূর্ব।

খাওয়া শেষ হোলো বড় বড় রসাল পীচ দিয়ে। জোর করে তিন তিনটে পীচ খাওয়ালেন মাদাম আস্তনভ। আমাদের গ্রীষ্মে আমের যে স্থান, ফ্রান্সের গ্রীষ্মে পীচের সেই স্থান। এত বড়, এত রসাল পীচ ইংলণ্ডে কখনও দেখি নি। 'বঁ, বঁ, পীচ ইজ্ গুদ্ ফর ইউ', বলেন এক গাল হেসে। রুশ আরমানী ফরাসী তিন ভাষাতেই মাদাম সুদক্ষ, ইংরেজীও বলেন বেশ সুন্দর। জার্মান একটু একটু। মা-মেয়ের কথাবার্তা চলে রুশে, তাত্য়ানা আরমানী ভাষা বোঝে কিন্তু বলতে পারে না।

খাবার বাসন প্রথম দিন মাদাম নিজেই মাজলেন। আমি সাহায্য করবার জন্য প্রার্থনা জানালেও আমাকে ছুঁতে দিলেন না। এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে প্রবেশ করলেন মাদামের ছোট ভাই। সঙ্গে মাদামের অশীতিবর্ষীয়া মা, মাদাম নার্সিসিয়েন—

—'কি রে আরাক্স, তোর অতিথি কই? ভারতীয় মেয়ে কোথায়?' নতদেহ বৃদ্ধা আমার দিকে এগিয়ে এলেন। গায়ে কালো পোশাক, ছোট ছোট ঝিনুকের চিরুনি দিয়ে সাজানো সুবিন্যস্ত পর্যাপ্ত রৌপ্য-শুভ্র কেশরাশি। কুঁচকানো চামড়ার মধ্যে থেকে উঁকি মারছে স্বচ্ছ নীল চোখ। আমার গায়ে পিঠে সস্নেহে হাত বোলাতে লাগলেন। 'তাত্য়ানার চেয়ে অনেক ছোট', বলেন মৃদু হেসে। মাদাম নার্সি-সিয়েন মাদাম আস্তনভের চাইতেও ভাল ইংরেজী বলেন। শুদ্ধ ইংরেজীতে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন—

—'তোমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের যোগ আছে। আরমানীরাও প্রাচ্য। ভাষার দিক থেকে একই ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতির অন্তর্গত আমরা। তা ছাড়া, পারিবারিক জীবন, মূল্যবোধ, পাপপুণ্যজ্ঞান, এ-সব ক্ষেত্রেও তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে। তোমাদের

দেশের দুজন পুরুষকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি ঃ তাগোরে আর গান্দী।
গান্দী ছিলেন একজন সন্ত, এক মহাপুরুষ, বিশ শতকের রাজনৈতিক
এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় তাঁর অবদান যে কত মহৎ তা ইয়োরোপে
আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। আর তাগোরে, আমি অবশ্য মাত্র
অনুবাদেই পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যেই বুঝতে পেরেছি, কি শক্তি আর
কি সৌন্দর্য তাঁর কবিতাতে। আমাদের আজ সৌভাগ্য যে তাঁদের
দেশের একজন আমাদের বাড়িতে অতিথি।'

'দিদিমা', বলে ওঠে তাত্য়ানা, 'তাগোরে যে ভাষাতে লিখে
ছিলেন, কেতকীরও সেই ভাষা, আর কেতকীও সেই ভাষাতে কবিতা
লেখে, জানো! ছাপায়, কাগজে বার হয় রীতিমত!'

তাত্য়ানার কাণ্ডে আমি লজ্জিত বিব্রত মুখ করতে থাকি। মা
দিদিমা দুজনেই 'বঁ বঁ' করে ওঠেন। 'হাউ ওয়াণ্ডারফুল!' বলেন
ছোটমামা। ইনিও নির্ভুল ইংরেজী বলেন।

মা মেয়ে আর মামা সিগারেট ধরান। তাত্য়ানা নিয়মিত
ধূমপায়ী নয়, তবে পাল্লায় পড়ে দু'-একটা খায়। গম্ভীর হয়ে যান
দিদিমা, বলেন—

—'কি যে ছাইভস্ম খাও তোমরা। আরাক্স তো কথাই শোনে
না, আশি বছর বয়সে কি আমার মত ভালো স্বাস্থ্য থাকবে!
তাত্য়ানা, তুইও ধরেছিস। অত্যন্ত বদভ্যেস। স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।
তুমি খাও না তো কেতকী? ভারতীয় মেয়েরা আশা করি ধরে নি
এখনও? শুরু করাটাই খারাপ।'

ব্যাকুল মুখে বৃদ্ধা তাকান আমার দিকে। 'না না, আমি খাই না'
সান্ত্বনা দিই তাঁকে। স্বাদ কি রকম জানবার জন্য পরম কৌতূহলবশত
দু'-একবার টান যে দিয়েছি, বা ভারতীয় মেয়েরা যে কেউ কেউ

:রেছেন আজকাল, তা আর জানালাম না তাঁকে।

'কেতকীকে তেরই জুলাইয়ের প্যারিস দেখাতে নিয়ে যাবি না?' :লে ওঠেন মঁসিয়ে নার্সিসিয়েন। হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে। সত্যিই তা। বাস্তিলদিবসের আগের সন্ধ্যা দেখবার জন্যই তো তের তারিখের কালে রওনা হয়েছি। 'তবে তোরা তৈরী হ। আমরা আসি', বলেন াদাম নার্সিসিয়েন। 'আবার আসবো, আবার আসবো' বলে শব্দে বিদায় নেন মঁসিয়ে নার্সিসিয়েন। বুঝলাম বেশ রসিক লোক তনি।

বেরোবার আগে একটু বিশ্রাম করে নেই আমরা। বিকেল ছ'টা াগাদ বেরিয়ে পড়ি। শমঁ্যা দে ভিন্ বাসস্টপ থেকে মেয়রী দিসি। সখান থেকে শহরের অভ্যন্তরে। কার্তিয়ের-লাতঁ্যায় পৌঁছতে পৌঁছতে পৌনে সাতটা বাজে। শহরতলির বাসে সবাই আমাকে লক্ষ্য করে, কন্তু শহরে অতটা নয়। ছাত্রক্যান্টিনে সান্ধ্যভোজন সারতে চায় াতিয়ানা কিন্তু—

—'তোমার অবশ্য টিকিট নেই।'

—'কেন, এখন কেটে নিলে হয় না?'

—'এখন কাটা যায় না। কাউন্টার রাত্রে বন্ধ থাকে। টিকিট াকালে কেটে রাখতে হয়।'

—'তবে কি হবে?'

—'চলোই না, দেখা যাক।'

অগণিত ছাত্রছাত্রীর মিছিলে যোগ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ক্যান্টিনের :দাতলার হল-ঘরে উঠতে থাকি আমরা। তাতিয়ানার হাতে তার ছাত্র-কার্ড (তাতিয়ানা আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ে আরও একটা ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেবে, সুতরাং এখনও অংশত ছাত্রী) আর টিকিট,

আমার হাতে আমার আন্তর্জাতিক ছাত্র-পরিচয়পত্র। সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছে চশমাধারী গুটি-দুই ছাত্র-পাণ্ডা। তাত্য়ানা তাদের একজনকে বিনীতভাবে বলে, 'আমার বন্ধুর জন্য একটা টিকিট কাটবো। খুব দুঃখিত। আগে সম্ভব হয় নি কেটে রাখা।' ছাত্র-নেতা ঈষৎ গুঞ্জন করে। তাত্য়ানা মিনতি করে। ছেলেটি বলে, 'আপনি বলছেন বটে। জানি, কারও ক্ষতি নেই কোনো। কিন্তু সবাই যদি এ কথা বলে তবে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চলবে কি করে? আচ্ছা, দিন, দেখি, কোথায় কার্ড?' আমার আন্তর্জাতিক ছাত্র-কার্ডটি মনোযোগ দিয়ে দেখে সে, চকিতে আমার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে নেয় ফোটো-গ্রাফ। তারপর ঈষৎ হেসে টিকিট দেয়, বলে, 'এইবার পালান। এর পর থেকে মনে করে সকালে কেটে রাখবেন।' 'তুমি বিদেশী দেখেই দিলে', বলে তাত্য়ানা, 'শাড়ির একটা প্রেস্টিজ আছে তো!'

বিশাল সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন ক্যান্টিনের দোতলার ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। মুগ্ধ হলাম ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা দেখে। স্থানীয় ছাত্রদের দিতে হয় মোটে এক ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ এক টাকা, বাইরের টুরিস্ট ছাত্রদের (আমার মত) তিন। বাকি খরচ ফরাসী সরকার বহন করেন। ছাত্রদের পুষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শর্করা, আমিষ, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ এবং খাদ্যপ্রাণসম্বলিত সুষম খাবার দেওয়া হয়ে থাকে। ভাত বা ডাল বা স্প্যাগেটি, মাংসের স্টেক এবং আলুভাজা, এ ছাড়া আরও একটি তরকারি, তাজা স্যালাড, দই বা পনীর, একটি টাটকা ফল। শুক্রবার মাংসের বদলে মাছ। ট্রে, কাঁটা-চামচ-ছুরি, নুনদানী, গেলাস, টেবিল, মেঝে, সবই ঝকঝক করছে, কোথাও এতটুকু ময়লা নেই। কাউন্টার থেকে খাবারে বোঝাই ট্রে নিয়ে ছাত্ররা আসছে, যে কোনো একটা টেবিলে খেয়ে নিয়ে অন্য এক কাউন্টারে ধোবার

ন্যে এঁটো বাসন ফেরত দিয়ে যাচ্ছে। শ'য়ে শ'য়ে ছেলেমেয়ে আসছে-যাচ্ছে, দ্রুতগতিতে হচ্ছে কাজ, ঝনাৎ ঝনাৎ জড়ো হচ্ছে ধৃ-ধোয়া উজ্জ্বল বাসনপত্র। এরা এত বেশি বেশি করে খাবার দেয় যে, খেয়ে কূল করা যায় না। বোতলে দুধ, বীয়ার বা কোকা-কোলা আলাদা পয়সা দিয়ে কেনা যায়। চতুর্দিকে অগণিত যুবক-যুবতীর গুঞ্জন। বহু আরবী ছাত্র চোখে পড়লো, আর ইন্দোচীনের ছাত্রও প্রচুর। আমার দিকে ফিরে তাকালো আহারে ব্যস্ত ছাত্র-সম্প্রদায়। 'শাড়ির একটা প্রেস্টিজ আছে তো।' আমার নিমেষের মধ্যে মনে পড়লো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাধীন ছাত্রসংঘ-পরিচালিত' ক্যান্টিন, তার ম্লান দেয়াল, অপরিচ্ছন্ন মেঝে, কটু তেলের দুর্গন্ধ, নোংরা বাসনপত্র, সর্বোপরি বালখিল্য পরিচারকবৃন্দ-কর্তৃক পরিবেশিত জীবাণুসংকুল পুষ্টিহীন শ্রীহীন আহার্য। প্যারিসের অনুরূপ উচ্চমানের ছাত্র-ক্যান্টিন আমাদের দেশে কবে হবে সে কথা ভেবে গলা আটকে এলো। দুস্তর ব্যবধান। আমাদের ছাত্ররা যেখানে কৃষ্ণনখ পরিচারকদের হাতের বাসি পচা নাড়িভুঁড়ির পিণ্ডকে প্রচুর লঙ্কাবাটার সঙ্গে গলাধঃকরণ করে 'চপ' খাওয়ার সাধ মেটাচ্ছে, সেখানে প্যারিসের ক্যান্টিনে হাসপাতালের নার্সের মত পরিচ্ছন্ন পরিচারিকারা শ্রীহস্তে অন্ন পরিবেশন করছে। সর্বের সস্‌টি পর্যন্ত একেবারে টাটকা, এইমাত্র তৈরি হয়ে এলো।

ডিনারের পর তাত্‌য়ানা আমাকে নিয়ে একটি উন্মুক্ত ক্যাফেতে বসলো। 'কি খবর, তাত্‌য়ানা,' বলে এক দল ছেলে এগিয়ে এলো। একটি ছেলে আমার সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময়ের পর আমার কাছে এক ফ্রাঙ্ক ভিক্ষা করলো। সারা দিন নাকি সে খায় নি। হেসে উঠলো অন্যেরা: 'ওর কথায় কান দেবেন না, ওর মাথায় ছিট আছে,

সবাইকে অমন বলে।'

'ওদের কথা শুনবেন না, আমার মাথা ঠিকই আছে', বিড়বিড় করে পাগলাটে ছাত্র, 'নেহরু কেমন আছেন? আহা, ভারতবর্ষের মেয়ে, কি সুন্দর ইংরেজী বলে। আমি মুগ্ধ হলাম। আমিও ভালোই বলি, তাই না?'

আমি ওকে আশ্বাস দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অন্যেরা 'চল্ চল্, অনেক হয়েছে' বলে সশব্দে হেসে টেনে নিয়ে গেলো। কি জানি, নেশা করেছে বোধ হয়।

সোনালী ফ্রেমের চশমা-পরা ছিপছিপে একজন বছর-ত্রিশেকের যুবক এগিয়ে আসে। 'জাক, তুমি এখানে—', চমকে ওঠে তাত্য়ানা, 'এই যে আমার ভারতীয় বন্ধু।'

'বুঝতে পেরেছি, স্বাগত, মুগ্ধ হলাম, আরেক কাপ কফি হোক।' গম্ভীর প্রকৃতির ছেলেটি। নানান বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। এদিকে উৎসব-উপলক্ষ্যে দলে দলে বেরিয়েছে সুসজ্জিত নরনারী। ঠিক কিভাবে আমাকে প্যারিসে ঘোরালে আমার তেরই জুলাই সার্থক হবে তা নিয়ে মতভেদ হয় তাত্য়ানা-জাকের। একজন বলে অমুক অঞ্চল, আরেকজন বলে অমুক। প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডার পর ঠিক হয় জাক তার গাড়িতে আমাদের নিয়ে সারা প্যারিসই চক্কর দেবার চেষ্টা করবে। অনতিদূরে জাকের গাড়ি পার্ক-করা। 'ওঠো', বলে তাত্য়ানা, 'এ হোলো আমাদের জাতীয় গাড়ি, দশভো, দেখতে ছোট্টটি এবং মজার, কিন্তু দারুণ শক্ত এঞ্জিন, এর নামই গাড়ি। আমি এরকম একটা কিনবো।'

জাকের দশভো গাড়িতে প্যারিসের পথে পথে প্রাক্-বাস্তিল সন্ধ্যা উদ্‌যাপন আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ওই

দন ফরাসী গাড়ির তথা চালকদের হাবভাব এবং কায়দাকানুন এমন এক জিনিস যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া উপলব্ধি করা যায় না। রাত যতই বাড়তে লাগলো ততই বেগে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগলো জাকের গাড়ি এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র স্বয়ংচলচ্ছকট। সামাল সামাল তরণী। যেন জোয়ার এলো প্যারিসের রাস্তায়। প্রাণবন্যায়, স্ফূর্তির নেশায়, চঞ্চলতায় উদ্দাম হয়ে উঠলো পদচারী গাড়িধারী উভয় দলই। প্লাবনের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেলো ট্র্যাফিকের আইনকানুন। কর্মব্যস্ত পিঁপড়েদের মিছিলে যদি অশান্তি আনা যায়, তবে তারা যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে, অসংখ্য সশব্দ গাড়ি তেমনভাবেই প্রবল বেগে সর্বত্র সঞ্চালিত হতে লাগলো। ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে পথে, বাঁধনহারা ছন্নছাড়ার মত। বাহুবদ্ধ হয়ে দলে দলে চলেছে কেউ কেউ। অজস্র গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে এঁকে-বেঁকে জনতার স্রোতও সমানে বয়ে চলেছে। গাড়িরা এক কথায় দিশাহারা পাগলপারা, তাদের ডানবাঁ ভেদাভেদ লুপ্ত। চতুর্দিক থেকে চতুর্দিকের উদ্দেশ্যে চলেছে তারা, ধাক্কা খেতে খেতে খাচ্ছে না, উলটে যেতে যেতে যাচ্ছে না, লোক চাপা দিতে দিতে দিচ্ছে না। খুশিতে ভরপুর জনতার এক তিল ভয় নেই, সশব্দে গাড়ির গায়ে থাপ্পড় মেরে অবিশ্বাস্যভাবে পথ করে নিচ্ছে। আমি এক দিকে সব অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করছি, অন্য দিকে প্রাণের জন্য জপছি হরিনাম। ভগবান ভগবান, দুর্ধর্ষ ফরাসী চালকের খেল থেকে এবারের মত প্রাণটা নিয়ে যেন নিষ্কৃতি পাই। প্যারিসে এসে শেষে কি বেঘোরে প্রথম রজনীতেই দুর্ঘটনায় প্রাণটা দিতে হবে? দু'ধারে যত বাতি আর ফোয়ারা ঝলসে উঠলো। আলোকসজ্জিতা নগরী উল্কার মত গাড়ির জানলার পাশ দিয়ে খসে যেতে লাগলো।

চতুর্দিকে উঠছে ভেঁপুর নিনাদ। সারা বছর ভেঁপু না বাজাতে পারা আফসোস, আজ যেন সুদে-আসলে চালকেরা উশুল করে নিচ্ছে তাদের পাওনা। কানে তালা লাগবার উপক্রম। খেয়াল করলাম ভেঁপু মারফত একটা বিশেষ আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে। প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ—প্যাঁপ্ প্যাঁ। তাত্‌য়ানা বললো, ওটার মানে হচ্ছে 'আলজেরি ফ্রাঁসেজ' অর্থাৎ আলজেরিয়া ফ্রান্সের। অবাক হলাম ভেবে যে স্বদেশের গৌরবময় বিপ্লবস্মারক উৎসবের মুহূর্তেও এরা বিদেশকে নিজেদের পদানত বলে ভাবতে পারছে। লুক্কায়িত ঔপনিবেশিকতা আহ্বান জানাচ্ছে। থেকে থেকে নিশানার মত ভেসে উঠছে তাত্‌য়ানার গলা। 'পিগাল···মোঁমার্ত···সাক্রে ক্যর···দ্যাখো, দ্যাখো, কি সুন্দর ঝলমল করছে।' সজ্জিতা সুপুষ্টদেহা নারীরা ইতস্তত হাতব্যাগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। 'ওরা গণিকা', জানায় তাত্‌য়ানা, 'খদ্দেরের আশায় রয়েছে।'

আমার মাথা যখন রীতিমত বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তখন ওরা এক জায়গায় গাড়ি থামালো। নামতেই ছেলের মুখোশ-পরা একটি মেয়ে কতগুলি কাগজের কুচি আমাদের মুখে ছুঁড়ে দিলো। এর নাম ফুর্তি। রাত তখন পৌনে বারোটা। তাত্‌য়ানা-জাকের মধ্যে তর্ক শুরু হোলো আমাদের কোথায় পৌঁছে দেওয়া হবে সে প্রসঙ্গে। ফেরার পথেও অবিশ্রাম চলতে লাগলো তাদের বাগ্‌বিতণ্ডা। অবশেষে মেয়রী দিসির জনপরিত্যক্ত মেট্রো স্টপের সামনে আমাদের নামিয়ে দিলো জাক। তখন ঠিক মাঝরাত।

'জাক, জাক', অসহায়ভাবে চিৎকার করলো তাত্‌য়ানা, 'আমরা এখন কী করে বাড়ি যাবো বলো তো, বাস তো বহুক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'ট্যাক্সি খোঁজো', বলে এক দ্রুত বাঁক নিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য
য়ে গেলো জাক আর তার মত্ত বাহন।

আরও আধ-ঘণ্টাখানেক পরে যখন ট্যাক্সি থেকে নামলাম,
াতয়ানাদের বাড়ি তখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অন্ধকারেই তাতয়ানা
রজা খুললো, ভিতরে ঢুকে আবার বন্ধ করলো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের
ধ্য দিয়ে হাত ধরে আমাকে পার করালো তাদের আঙিনা।
াঙিনার এক পাশেই দু'খানি ছোট ছোট খুপরীতে প্রাকৃতিক
ার্যাদি সারতে হয়। দিনের বেলা লক্ষ্য করেছিলাম যে, সেপটিক
াঙ্ক ব্যবস্থা এবং ফ্লাশ নেই, এখন সভয়ে জানলাম বাতি নেই।
িঁড়ির নিচে তাতয়ানা আমাকে বিদায় দিলো। ও শোবে উঠানের
াশেই একটা ঘরে, যেটা আমি দিনের বেলা দেখি নি। মাদাম
নেকক্ষণ শুয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত দেহে উপরে এসে শোবার জন্য তৈরি
য়েছি, এমন সময় দেখলাম, তাতয়ানার প্রিয় বিড়াল বালিশের
পর প্রচুর লোমত্যাগ করে সুখনিদ্রাভিভূত! আমার 'হুশ্-হাশ্
ই নাম্' ইত্যাদিতে একটুও বিচলিত হোলো না। বুঝলাম, বাংলা
ানে না এই মার্জার। অগত্যা নিরুপায়। আবার সভয়ে নামলাম,
ারানো সিঁড়ি বেয়ে, অতিক্রম করলাম অন্ধকার ঘরগুলি, এলাম
ানে। তাতয়ানার জানলায় উঁকি মেরে দেখি শুয়ে পড়েছে, তবে
মায়নি নিশ্চয়ই। ডাকলাম—

'তাতয়ানা, তোমার বিড়াল—'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। সত্যিই দুঃখিত। আমার সঙ্গে রোজ
ই বিছানাতে শুতো কি না। কি করে বুঝবে বেচারী যে, আজ
কে নতুন ব্যবস্থা হয়েছে।'

তাতয়ানা তার বিড়ালকে নিয়ে যাবার পর শয্যাস্থ হলাম।

নেভি-ব্লু রঙের সুজনীটা বিড়ালের লোমে একেবারেই সমাচ্ছন্ন আগে লক্ষ্য করি নি। বিড়াল-গন্ধে আমোদিত নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে মনে পড়লো তাতয়ানার অক্সফোর্ডে উচ্চারিত কথা: 'না না, বিছানা তুমি একটা পাবে···তবে খিদে পাবে তোমার।'

॥ চার ॥

'খিদে পাবে তোমার।' কথাটা মিথ্যে বলে নি তাত্য়ানা। প্রচ্ছন্ন খিদে-খিদে ভাবের সঙ্গে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যেতে হোলো। আস্তনভ-পরিবারে রান্নার পাট সংক্ষিপ্ততম সংস্করণে পৌঁছেছিলো, অনিবার্য কারণে। সকালে উঠে হোতো চা, রুশ মতে লেবু দিয়ে, এবং থাকতো মাখন ও পনীর সহযোগে বিস্কুট ও টোস্টের মাঝামাঝি পর্যায়ের প্যাকেটে ক্রেতব্য সামগ্রী। মাদাম আস্তনভ সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই কাজে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সেই সন্ধ্যায়। রুটি-পনীর ছাড়া অফিসে কিছুই গ্রহণ করতেন না। ফলত মধ্যাহ্নভোজনের আড়ম্বর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাত্য়ানা সাধারণত দু' বেলাই ছাত্র-ক্যান্টিনে খেতো, আমি আসাতে তার হার একটু কমালো। রাত্রে মাদাম এত ক্লান্ত থাকতেন যে বিশেষ কিছু করতে পারতেন না, তবে রাশি রাশি স্যালাড করতেন, পরম উপাদেয়। আর নিজের জন্য হাঁড়ি না চড়ালেও প্রতি সন্ধ্যায় যেটা তৈরি করতে কখনও ভুলতেন না সেটা হোলো তাঁর কুকুরদের জন্য দু' ডেকচি খাবার, কুস্‌কুস্‌ নামে আফ্রিকান সুজির দানার সঙ্গে তরিতরকারি সিদ্ধ। নিরামিষ আহার থেকেই যথেষ্ট তেজ সংগ্রহ করতো জিজি আর বুদা।

সব থেকে দেরি হোতো ছুটির দিন দুপুরে খেতে। তাত্য়ানার মামা-দিদিমারা আসতেন, হই-হল্লায় বেলা গড়াতো, খেতে খেতে

তিনটা। নতুন জায়গায় খিদে বাড়ে, কে না জানে। প্যারিসের রমণী পথে পথে জুলাই মাসের সকাল-দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরতে দু'পাশের লোভনীয় রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের প্রতি আমা প্রীতিপূর্ণ মনোভাব উদিত হোতো না। তাত্য়ানা কিন্তু নির্বিকার। নিজেই স্বীকার করতো, ওর খাবারের চাইতে ঘুমটাই বেশী লোভনী মনে হয়। 'আমাকে ডিনার না দাও কিচ্ছু এসে যায় না, কিন্তু ঘুম আমার চাই, আমি তন্দ্রালু মেয়ে!'

কাজের ফাঁকে ফাঁকেই নানারকমের সহজ অথচ সুস্বাদ পদ রেঁ খাওয়াতেন মাদাম আস্তনভ। রসুন দিয়ে প্রেশার-কুকারে বেগু এবং টোমাটো একত্র রান্না করার প্রণালী তাঁর কাছেই প্রথ শিখলাম। পেঁয়াজ আর বরবটির তরকারি যে কত লোভনীয় হ পারে তাও দেখালেন তিনিই। এক শনিবার সকালে আমাকে নিয়ে গেলেন ম্যদঁ-র বাজারে, উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, আমাকে বাজার দেখাতে এবং পাড়াপড়শী আর দোকানদারদের ভারতীয় মেয়ে দেখাতে। পীচ ওয়ালার ঝুড়ি থেকে একটি পীচ তুলে মুখে দিয়ে হাসতে হাসতে উধাও হোলো স্থানীয় পাগলী। পীচ-ওয়ালা ব্যর্থ হাঁকাহাঁকি করলে বাজারে উঠলো প্রতিবেশী দোকানদারদের হাসির হররা। আমা প্রতিশ্রুতিমত আমি আস্তনভ-পরিবারে ভাত, মাছের ঝোল, মাংসে কোপ্তা, ডিমের ডালনা প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক পদ পরিবেশন করলাম ঝুরঝুরে ভাত, অথচ ফেন ফেলি নি, তা দেখে মা-মেয়ে উভয়েই মুগ্ধ।

—'দ্যাখো দ্যাখো, কি চমৎকার ভাত, মা।'

—'আমার তো একাল গেলো, শেখ, তুই শিখে রাখ বেটী।'

এক এক দিন তাত্য়ানা সকালে লাইব্রেরীতে চলে যেতো। খাঁখাঁ করতো বাড়িটা। জিজি বুদা দু'জনকে এক ঘরে বন্ধ করে রেখে

প্যাগেটি সিদ্ধ করতে বা বেগুন-কুমড়ো ভাজায় প্রস্তুত হতাম আমি। াধারণত মাদাম নার্সিসিয়েন সে সময়টা বেড়াতে আসতেন। াগাছায় ভর্তি উঠানটার এক কোণে রোদ পোহাতেন আর পড়তেন বরের কাগজ। পরনে সর্বদাই কালো পোশাক, গলায় মুক্তার ালা, মাথায় পিনদ্ধ ঝিনুকের চিরুনি। আমাকে রাঁধতে দেখে এগিয়ে াসতেন।

—'ছি ছি, কী যে করে আরাক্সীটা। ঘরে অতিথি এনে সবাই বরিয়ে যায়। অতিথিকে নিজে করে খেতে হয়। দাঁড়াও, আমি রে দেই।'

—'না না, এ কিছুই কঠিন না, খুবই সহজ এটুকু করে নেওয়া। ামার অভ্যাস আছে', বলে উঠি আমি।

বৃদ্ধা সন্দিহান, আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমাদের মতই—

—'না না, এসব কি তোমাদের কাজ, এই ছাখো না আমি কি ুন্দর কুমড়ো ভেজে দেই।'

অগত্যা তাঁকে খান দুয়েক টুকরো ভাজবার আনন্দ দিলাম। এক াল হেসে প্লেটে কালো বিশীর্ণ আধপোড়া টুকরো দুটি ফেরত নিয়ে লেন। আকাশনীল চোখ মিটমিট করে প্রশ্ন করেন বৃদ্ধা—

—'পুড়ে-টুড়ে যায় নি তো? আমি আবার আগের মত চোখে দখি না। কি জানি কখন তলায় লেগে যায়।'

—'না না, সুন্দর হয়েছে', আশ্বাস দেই আমি।

—'আর দুটো ভেজে দেই?'

—'না না, এই যথেষ্ট, অসংখ্য ধন্যবাদ।' ব্যস্ত হয়ে বাধা তে হয়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন মাদাম ার্সিসিয়েন—

—'এখন কি আব সেরকম হাত আছে আমার। রাঁধতে পারত
বটে এককালে! আজকাল এরা বলে, আমি নাকি চোখে দেখি
সব নাকি পোড়াই। আরাক্সীটার রান্নায় একটুও মন নেই। হ
বা কি করে, যে কষ্টটা পেয়েছে জীবনে।'

প্লেট থেকে চোখ তুলতে দেখি ভাঙা পাঁচিলের দিকে একদৃ
চেয়ে রয়েছেন মাদাম নার্সিসিয়েন। ক্ষীণদৃষ্টি নীল চোখ দুটি জ
টলমল করছে, কুঞ্চিত দুগ্ধশুভ্র ত্বকের উপর গড়িয়ে পড়েছে ক
ফোঁটা অশ্রু। বুঝলাম বর্তমান ঝাপসা হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টিে
অলৌকিক দৃশ্যাবলীরূপে ভেসে আসছে অতীত।

'এ কী, চোখে জল কেন', অনুযোগ করি, 'কিসের কষ্ট আপনা
আমাকে বলুন, মাদাম।'

অনেকবার বলতে গিয়ে বলতে পারেন না। কেঁপে কেঁপে উ
বন্ধ হয়ে যায় গোলাপী ঠোঁট দুটি। তারপর চোখ মোছেন আধময়
রুমালের প্রান্তে।

'কিছু না, এই আমার ছেলেমেয়েদের কথা ভাবছিলাম। আমা
ছেলেগুলো এক একটা এক এক মূর্তিমান। ছোটটাকে তুমি দেখছো
সেটা ভালোই, তবে তার বউটা যেন কেমন, ঠিক আপন হোলো না
তাই তো ওদের বাড়িতে বেশী দিন থাকতে পারি না। মন টেকে না
চলে আসি এখানে।

'আমার বড় ছেলে ছিলো দারুণ সুপুরুষ। এখনও দেখলে বো
যায়, যদিও চুলগুলি সবই সাদা হয়ে গেছে। এই ছেলেটা আমা
একটু দুরন্তই ছিলো, কত মেয়েকে যে নাচিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই
আর মেয়েগুলোও নাচতো। সব ওর প্রেমে হাবুডুবু খেতো। প্রথ
বউটাকে ডিভোর্স দিলো। পরের বউটা গেলো মরে। তৃতীয় বউট

জায় বাচ্চা, এখন সেয়ানা বাবুটি কচি বউয়ের খামখেয়ালের গোলাম।

'আমার মেজ ছেলে বিয়ে করলো এক ইংরেজ মেয়েকে। থাকতে লো শেষ পর্যন্ত আমেরিকায়। সাত বছর পরে এই হঠাৎ গত মাসে য়ারোপে এলো। কী, না, তার অর্বাচীন ছেলেমেয়েদের ইয়োরোপ খাবে। তিন মাস ইয়োরোপে ভ্রমণ করলো। ফিরে যাবার সময় টি দিন—না, কয়েক ঘণ্টা মাত্র—এনগেজমেণ্ট করে মা-ভাই-নদের সঙ্গে দেখা।'

রুমালে আবার চোখ মোছেন মাদাম নার্সিসিয়েন।

'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তোমাদের দেশেও তো পারিবারিক ন খুব দৃঢ়। সাত বছর বাদে ছেলে দেশে ফিরলো; মাকে দেখতে , বাচ্চাদের ইয়োরোপ দেখাতে। আমেরিকার টাকায়। মেরিকানদের কাছে ইয়োরোপ প্রমোদ-উদ্যান। ডলার খরচ করে হাজে চড়ো, বেড়িয়ে যাও, বাচ্চাদের দেখিয়ে নাও। কিন্তু মা, যে অপেক্ষা করে রয়েছে বছরের পর বছর, তার জন্য কয়েক ঘণ্টার শী খরচ করা অপব্যয় মাত্র।'

আমার মুখে আসে সান্ত্বনার গুঞ্জন:—'তবু তো আপনার ছেলে-য়েরা সবই মোটামুটি সুখে স্বাস্থ্যে জীবিত আছে, মাদাম। সেটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা।'

—'ঠিক। তা আছে। ওদের শিক্ষার জন্য কি কম খরচপত্র করেছি মরা? আমার স্বামী আর আমি কি পরিশ্রমই না করেছি ওদের ড়ে তুলবার জন্যে। আজ তুমি দেখছো বটে আরাক্সীর এই ভাঙা দোর, কিন্তু চিরকাল এরকমটা ছিলো না। এখনকার ব্যাপার হোলো রাক্সী রুশ ছাপাখানাতে যে কাজটা করে তাতে বিশেষ আয় হয় , খাওয়ার খরচ-টরচ চলে মাত্র। ভাগ্যিস বাড়িটার ভাড়া দিতে হয়

তাই চলে যাচ্ছে। আর এই ঝুরঝুরে বাড়িটার পিছনে কে-ই বা
।কা ঢালবে বলো? তাতয়ানার যদি একটা পাকাপাকি চাকরি
হতো, তবে কিস্তিতে একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারতো। ফ্ল্যাটের যা
দাম প্যারিস শহরে…'

—'কিন্তু তাতয়ানা যে বাড়ির চাইতে গাড়ি কেনাই আপাতত
বেশী প্রয়োজনীয় বলে? ও বলে গাড়ি কিনলে ও তাতে করে সারা
প্যারিস শহর চষে বেড়াবে ঘরে ঘরে রুশ ভাষা শিখিয়ে। রুশ ভাষার
প্রাইভেট টুইশনি করে বড়লোক হওয়া নাকি প্যারিসে মোটেও
অসম্ভব নয়। সেই টুইশনির টাকা জমিয়ে নাকি বাসাবদল হবে
সুদূর ভবিষ্যতে। অক্সফোর্ডের চাকরির প্রায় পুরো টাকাটাই তো এ
দেশেই জমছে। কিন্তু মাদাম, উঠানে যে বিরাট গাড়িটা রয়েছে, ওটা
কার? একটা গাড়ি থাকতে আরেকটা দিয়ে কি হবে?'

—'ওটা তোলো পাপের গাড়ি। তবে সবটাই শোনো। এখন
আমাকে লোলচর্ম দেখছো বটে, কিন্তু গত শতাব্দীর শেষে যখন প্রবাসী
রবমানীদের সম্মানার্থে লণ্ডনে বিরাট নৃত্যোৎসব হয়, তখন সে
উৎসবে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে ছিলাম আমিই,' লজ্জিত হাসি হেসে
পুরোনো দিনের কথা স্মরণে আনেন মাদাম নার্সিসিয়েন, 'হ্যাঁ, সেই
নাচেতেই তাতয়ানার দাদামশায়ের সঙ্গে প্রথম দেখা। এক মাসের
মধ্যেই সাক্ষাৎ, প্রেম এবং বিবাহ। স্ফূর্তিতে ভরপুর সুপুরুষ
প্রাণোচ্ছল ছিলো আমার স্বামী। বাকু-তে ছিলো ওর কারখানা।
বাকু জানো তো—ক্যাস্পিয়ানের ধারে বিখ্যাত শহর বাকু।
বাকুতেই আমার ছেলেমেয়েদের জন্ম। আমাদের সমাজে তখন
রেওয়াজ ছিলো ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য ইয়োরোপের কোনো
বড় শহরে কয়েক বছর স্কুলে বা কলেজে রাখা। এককালে আমিও

মন ছিলাম, তেমন আমার আদরের আরাক্সীকেও বছর দু'-এক লণ্ডের বোর্ডিং স্কুলে রেখেছিলাম। বাকুতে ছেলে-বুড়ো সবাই আমার স্বামীকে দারুণ পছন্দ করতো। কারখানার শ্রমিকেরা ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। ওদের জন্য ও একাধিক স্কুল খুলেছিলো। সব স্কুলে আমিও পড়াতাম। বিয়ের পর আমি প্রত্যেক বছরই একবার ইয়োরোপে আসতাম, আমার সমস্ত মার্কেটিং সেখানেই করতাম। লণ্ডন থেকে সারা বছরের জন্য বাজার করতাম ছেলে-মেয়েদের জিনিসপত্র। এখানকার মেয়েদের এখন যেমন ছ্যাখো, আমাদের জীবন সেরকম ছিলো না। গলায় হার পরতাম, কান বিঁধিয়ে দুল পরতাম। এখনও মনে পড়ছে বাকুতে একটা দিনের কথা। আরাক্সী প্রথম নাচে যাবে, ওর বাবা সন্ধ্যায় সবে কারখানা থেকে ফিরেছেন। এসেই ডাকতে লাগলেন—আরাক্সী, আরাক্সী। আরাক্সী এলো, লম্বা সাদা পোশাকে কি মিষ্টিই না দেখাচ্ছিলো ওকে। একটা ছোট বাক্স থেকে একটা মুক্তার মালা নিয়ে বললেন, দেখি তো তোকে কেমন লাগে এটাতে। তারপর বললেন: বেশ দেখাচ্ছে, আচ্ছা, তবে তুই ওটা রেখে দে, ওটা তোকেই দিলাম। আরাক্সী তার বাবাকে চুমু খেয়ে ধন্যবাদ জানালো। উনি ঐরকমই ছিলেন, যখন-তখন হাতে উপহার নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। গয়নাগাটি কিছু কিছু ছিলো আমাদের। এখন আমার গলায় এটা আর আরাক্সীর বুঝি একটা আছে; আর কিচ্ছু নেই। বেচারী আরাক্সীর শখ আছে একটু আধটু। ওর ইচ্ছা নিজের মেয়েটার হাতে দু' একটা গয়না তুলে দেয়, সাধ্য কই? মেয়েকে বুঝি একবার একটা ফিরোজার আংটি দিয়েছিলো। তা সে মেয়ের যে কী হলো, বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত এটা সেটা বেশ পরতো। তারপর থেকে হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে, হাতে

একটা পাতলা ব্রেসলেট ছাড়া। ওকে নাকি আর মানায় না। বা
কথা। কি বলো?'

—'বাজে কথা বই কি', আমি সায় দেই। তাত্য়ানা তার অ
দামের 'কস্‌টিউম জুয়েলারী'-র সংগ্রহ আমাকে দেখিয়েছিলো। ভা
সুন্দর সুন্দর জিনিস। ওর জীবনের আফগান পর্যায়ে ও খুব ওস
পরতো। তারপর···। আধো চাঁদের নক্‌শায় রূপোর উপর মিনে-ক
এক জোড়া দুল এবং লকেট-সংবলিত হারের একটা সেট ছিলো। সে
সে আমাকে দেবেই। জিনিসটা ইরানী, সে এক বেদেনীর কাছ থে
কিনেছিলো। 'বিশ্বাস করো, আমি আর কখনোই পরবো না। তু
নাও, পরবে আর আমার কথা মনে করবে।'

মাদাম বলে চললেন—

—'তারপর এলো আমাদের জীবনের সব থেকে বড় পরীক্ষা
প্রথম মহাযুদ্ধ আর রুশ বিপ্লব। তখন দলে দলে বুর্জোয়া রুশ এব
আরমানীরা ইয়োরোপে চলে যেতে শুধু করেছে। বাকু থেকে
একাধিক পরিবার বিদায় নিলো। নার্সিসিয়েন প্রথমে তো কিছুতে
তার ভিটেমাটি ছাড়বে না। সারা শহরে তার প্রতাপ প্রতিপত্তি
অশেষ ছিলো। সবাই তাকে আশ্বাস দিলো, তার শ্রমিকেরা প্রাণপণ
করে তাকে রক্ষা করবে কথা দিলো। ভয়, আশা, আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা,
উত্তেজনা, এসবের মধ্য দিয়ে তখন আমাদের দিন কাটছে। ইয়োরোপের
ভবিষ্যৎ কি, আরমানীদের কি হবে, আমরা দেশত্যাগ করবো কি না,
এই নিয়ে চলতো সশঙ্ক জল্পনা। এসব গোলমালের মধ্যেই এক ফাঁকে
আরাক্সীটার পাখনা গজালো। এক ছুটিতে ইয়োরোপ থেকে বাকু
ফিরেছি—তখন চতুর্দিকে অশান্তি, বাকুতে আমাদের খুঁটি নড়ে উঠেছে
—হ্যাঁ, ফিরেছি কি চিঠি এলো। তিনি লণ্ডনে এক দেশত্যাগী রুশের

প্রেমে পড়েছেন এবং অব্যবহিত কাল পরেই প্যারিসে শুভবন্ধনে বদ্ধ হয়েছেন। ছ্যাখো কাণ্ডটা। ব্যাপার কি, না মায়ের আদর্শে নুপ্রাণিত হয়েছেন তিনি। তখন কীই বা ওর বয়স। অত বিবেচনা রে নি। আরাক্সী যে খুব একটা রূপসী ছিলো তা নয়, তবে মিষ্টি লো অসম্ভব—'

—'কী যে বলেন, মাদাম', বাধা দিয়ে উঠি আমি, 'মাদাম াস্তনভের কৈশোরের প্রতিচ্ছবি যেন দেখি নি আমি। মনভোলানো মিষ্টি হাসিতে ভরা মুখখানি। সুন্দরী ছিলেন না তিনি বিশ্বাস করি না আমি। এখনও প্রৌঢ়ত্বের অন্তরাল থেকে হাতছানি দিচ্ছে তাঁর যৌবনের লাবণ্য। সৌন্দর্যের বড় কঠিন সংজ্ঞা দিচ্ছেন আপনি। নিখুঁত সুন্দরী কমই দেখা যায় পৃথিবীতে, এবং তার প্রয়োজনও কম। কিন্তু হৃদয়ের প্রীতি এবং বিবেকের নির্মলতা থেকে উৎসারিত যে মোহন হাসি তার স্পর্শই ঐন্দ্রজালিক।'

মিষ্টি হেসে আমার দিকে তাকান বৃদ্ধা—

—'তোমার কথাই ঠিক। আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। পেটের মেয়ের প্রশংসা বেশী করতে চাই না। কিন্তু আরাক্সীর মনটা ছিলো সোনা দিয়ে তৈরি। নিষ্পাপ হাসিটি ছিলো তার ব্রহ্মাস্ত্র। 'বিউটি"-র সংজ্ঞা কঠিন বটে, কিন্তু "সুইটনেস", "লাভলিনেস", "চার্ম" এ সমস্ত বলতে আমরা যা বোঝাই সে ছিলো তারই রূপায়ণ।'

অনুমান করলাম মাদাম নার্সিসিয়েন নিজে ছিলেন তিলোত্তমা, ক্লাসিক অর্থে। রূপশালিনী এবং দীপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। উপরন্তু বিত্তশালী ঘরের বউ। তাঁর মেয়ের রূপে বা মেধায় মায়ের মত হীরার ধার হয়তো ছিলো না, কিন্তু ছিলো মুক্তার মৃদু আলো: ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।

—'কিন্তু কি জানো, আস্তনভ আসলে ওর যোগ্য ছিলো না
একে একে এলো তিনটি ছেলেমেয়ে। প্রথম প্রথম মনে হোতো সব
বুঝি ঠিক চলছে। কিন্তু আস্তে আস্তে গেলো সবই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে
পর সব অন্যরকম হয়ে গেলো ওর জীবনে। এই বাড়িটায় তখন উ
এলো আরাক্সী, আমার ছোট ছেলে যোগাড় করে দিলো। আ
তো কারখানা ছিলো এটা, এরা কোনোমতে বাসযোগ্য করে নিয়ে
মাত্র। প্রথমে ইচ্ছা ছিলো দু' বছর পরই ভালো একটা ফ্ল্যাটে উ
যাবে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর আর্থিক অবস্থা যে কী হবে তা কি আগে কে
ভাবতে পেরেছিলো? পরের বছর, পরের বছব, করতে করতে এ
গ্যাখো না বারো-চৌদ্দ বছরের উপর হয়ে গেলো। আর আস্তনভ
তাকে আর "জামাই" বলে ভাবতে পারি কি? তবু সে যে আমা
নাতি-নাতনীদের বাপ! সে এখনও আসে বটে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু ন
আসলেও পারে। ছেলেমেয়েরা, বিশেষত তাত্য়ানা, তাকে দু' চক্ষে
দেখতে পারে না। পারবেই বা কি করে? অন্য একটা মেয়েমানুষকে
নিয়ে যে ঘর করছে সেরকম বাবাকে কোন মেয়েই বা সহ্য করতে
পারে? মায়ের দুঃখে বুক ফেটে যায় না তার? মায়ের দুঃখ মেয়ে
বোঝে। তাই তার দুর্জয় অভিমান। বাপবেটীতে দেখা হলেই একটা
কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। আজকাল আস্তনভ অবশ্য মধ্যে মধ্যে আর্থিক
সাহায্য করতে চায়, কিন্তু মা-মেয়ে তা স্পর্শ করবে না। উঠানের
গাড়িটা তো আস্তনভেরই। রেখে গেছে; ইচ্ছা, ছেলেমেয়েরা চালায়।
কিন্তু ওরা ও গাড়ি ছোঁবে না। ওবা বলে ওটা পাপের গাড়ি। বিরাট
যন্ত্রটা ধূলায় পড়ে রইলো। আরাক্সীর কিন্তু সহ্যশক্তি কম না। এই
যে এত যন্ত্রণা, এর মধ্যেও মুখের হাসিটি অবিকল আছে। আইনের
দরজায় যাবে না, আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেবে না. আংটিটা ছাড়ে নি

স্বামীর নামেই নিজেকে জগতের কাছে জানাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পদবীও বাপের পদবী অনুসারেই। তাদের যত্ন করে রুশ শিখিয়েছে ঃ দেখেছো তো, রুশেই কথাবার্তা বলে তাত্য়ানার সঙ্গে। আর কখনও রুশদের এক বিন্দু নিন্দা শুনবে না কেউ আরাক্সীর মুখে। চোখের সামনে আমার আদরের বড় মেয়েটার অবস্থা নামতে দেখলাম। সাহায্য করতে পারি নি কিছুই। বাকু থেকে শেষ পর্যন্ত চলে আসতে হয় আমাদের। নার্সিসিয়েনের অনেক টাকা এক জার্মান ব্যাঙ্কে ছিলো। সব টাকা গেলো। আমার ছোট ছেলেটাই শেষ পর্যন্ত সব থেকে বেশী সাহায্য করেছিলো তার দিদিকে। অন্যেরাও কিছু কিছু করেছিলো অবশ্য। ওদের সবাইকে যে হাজার বিপদের মধ্যেও আপ্রাণ কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, সেটাই সব থেকে কাজের কাজ করেছিলাম। সব ক'টাই পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে। করে খাচ্ছে তো অন্তত। কেউ বসে নেই। তবে এত যে করলাম, তা সত্ত্বেও একটা স্থির গৃহ পেলাম না আজ পর্যন্ত। কোথায় থাকি। একটা সমস্যা। পালা করে ছেলেমেয়েদের বাড়িতে থাকি। প্রধানত ছোটটার ওখানেই। তবে' ওর বউটা এক একদিন মেজাজ এমন খারাপ করে দেয় যে, তখনই পোটলাপাটলি নিয়ে চলে আসি এখানে। এখানে থাকবার জায়গাই নেই। কোনোমতে ভাঙা খাট বা সোফাতে রাত কাটাই, মাথার কাছে হোল্ডলটা রাখি। এমনই দুনিয়ার নিয়ম। আমার নার্সিসিয়েন ছিলো আদর্শ স্বামী। অথচ দ্যাখো, সে চলে যাবার পর থেকে তার বিধবা স্ত্রীর আর ঘর নেই।'

মুহূর্তে যেন ইন্দির ঠাকরুনটি হয়ে ওঠেন এই একদাবিদগ্ধা বৃদ্ধা। মনে পড়ে আমাদের দেশের প্রবচন, ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

জিজি-বুদার ভৌ-ভৌ শব্দে তাত্য়ানার আগমন সূচিত হয়।

গল্প করতে করতে কখন বেলা গড়িয়ে বিকাল হয়েছে। পোড়া কুমড়োর অবশিষ্টাংশ রোদে শুকিয়ে প্লেটের গায়ে আঠার মত আটকে গেছে।

—'দিদিমা বুঝি সুখদুঃখের গল্প করছে তোমার সঙ্গে ?' তাত্য়ানার গলা শোনা যায়।

সন্ত্রস্ত হয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ান বৃদ্ধা—

—'না না, তোর বন্ধুকে এই দু' চারটা সাধারণ কথা বলছিলাম আর কি।' আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে যান মাদাম নার্সিসিয়েন।

—'কি ব্যাপার, সারা দুপুর গল্প ? অর্থাৎ ঘরোয়া, সাংসারিক কথাবার্তা ?' হাসতে হাসতে বলে তাত্য়ানা, 'ঘরের সুখদুঃখের কথা হচ্ছিলো কি না বলো ? ঠিক ধরি নি ?'

হঠাৎ প্লেটের উপর চোখ পড়তেই আবার চোখ তোলে তাত্য়ানা—

—'সর্বনাশ, দিদিমা বুঝি কুমড়ো ভাজা খাইয়েছে তোমাকে ! দিদিমার ধারণা আসলে দিদিমা চোখে ঠিকই দেখে। তোমাকে একাটি পেয়ে তাই আজ তোমার উপর হয়েছে এক্সপেরিমেণ্ট। জানে তো আমরা ধরা দেবো না। বেশ, কেমন লাগলো কুমড়ো-পোড়া সেটি এবার আমায় বলো।'

—'এই চুপ করো, তাত্য়ানা', বলি আমি, 'বুড়ী দিদিমা সম্বন্ধে অমন করে বলে না।'

—'বুঝেছি, বুঝেছি, সুখদুঃখের গল্প শুনে মনটি গলেছে !'

তাত্য়ানার বিড়াল মিঁউ মিঁউ শব্দে রান্নাঘরের জানলা থেকে অনুনয় জানাতে থাকে। ওর কাছে ছুটে যায় তাত্য়ানা, রান্নাঘরের তাক হাতড়ায়। কিন্তু দুধের বোতল শূন্য, সব ফুরিয়ে গেছে।

—'ষাট ষাট, সোনামণি বিড়াল আমার, তোর জন্য দুধ নেই বুঝি? কি অঘটন! তাই তো, একবার দোকানে যেতে হয়, নয়তো খাবার বন্ধ হয়ে যাবে।'

এক ছুটে তাত্যানা এক বিরাট বোতল দুধ কিনে আনে, একটা সাধারণ বোতলের দু'-গুণ হবে। ঢকঢক করে একটা বড় পিরিচে ঢেলে দেয়, আর বলতে থাকে—

—'খা খা, লক্ষ্মী বিড়াল।'

তাত্য়ানাকে নিজে কোনো দিন ঢেলে এক গেলাস দুধ খেতে দেখি নি (তার সময় হোতো না বা মনে থাকতো না!), কিন্তু তার বিড়ালের জন্য প্রতিদিন বড় বোতলের আধ বোতল দুধ বরাদ্দ ছিলো। আর সে দুধের স্বাদ? তার ঘনত্ব? দুধ যে সেরকম হতে পারে, তাই কলকাতার লোক ভুলে গেছে। মনে পড়লো কলকাতায় আমাদের পুষির কথা, বাড়ির সকলের জন্য বরাদ্দ হবার পর অবশিষ্ট কয়েক হাতা দুধ, তাতেই তার কি কৃতজ্ঞ গোঁফ-চাটা! তা ছাড়া আমিই যদি কোনো দিন বিকালে বাড়ি ফিরে হঠাৎ দরকারের জন্য দুধ কিনতে বেরোতাম, তবে কি কলকাতার মত 'আন্তর্জাতিক' শহরে মাথা খুঁড়েও এক বোতল দুধ পেতাম?

॥ পাঁচ ॥

আমাদেব রাস্তাটিব নাম ছিলো আভেনিউ আউগুস্ত্ বর্দ্যা। ভাস্কব বর্দ্যা-র নামে। বাড়ির উল্টোদিকেই একটি ছোটখাট রর্দ্যা মিউজিযাম। সে বাড়িতে রর্দ্যা বেশ কিছুকাল ছিলেন। প্যাবিসে বৃহত্তব রর্দ্যা মিউজিয়াম দেখবার পব এক সন্ধ্যায় উৎসাহিত বিবরণ দিচ্ছি; মাদাম আস্তনভ বলে উঠলেন, 'সে কি, বড় মিউজিয়াম দেখা হয়ে গেলো ঘরের সামনেব ছোট মিউজিয়াম দেখাব আগেই? চলো, কালকে রোববার আছে, কালকেই দেখাবো।'

এ ঘটনাটি আমাব এ অধ্যায়ের যোগ্য উপক্রমণিকা। শহব দেখতে এসেছি সত্যিই, কিন্তু শহরতলির আনাচে-কানাচে যে গল্প লুকিয়ে আছে তাব হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়?

চতুর্দিকে আবমানী পল্লী। ছোট ছোট শ্রীসম্পন্ন গৃহস্থবাডি। এক ফালি বাগান, একটু লতাব আভাস, কয়েকটি টব, কাঠের এক-রত্তি লেটারবক্স, বাগানেব গেটেব ফলকে পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি ' দুষ্টু কুকুর।

বাস্তার মোড়ে আরমানী মুদীর দোকান। সেখান থেকে পয়সা গুনে গুনে সস্তা থেকে আবও সস্তাব জিনিস কেনার চেষ্টা করতাম। 'একটা বড় পাতি লেবু, দুটো টোমাটো, এতটুকু মাখন—এই এতটুকু, এক চিলতে, যতটা কম আপনি বেচবেন।' আমার উক্তি শুনে বিশাল গোঁফের অন্তরালে মৃদু হাসতো আবমানী মুদী। এ দোকানের মস্ত

়বিধা এই ছিলো, কম-কম করে জিনিস কেনা যেতো। বড়লোক
াড়ার অহংকারে ফেটে-পড়া দোকান নয় যে, এক পাউণ্ডের নিচে
কছু চাইতে তোমার লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। এই দোকানটার
ম্পূর্ণ উল্টো ধরনের কতগুলো মুদীর দোকান দেখেছিলাম প্যারিসের
এক জনবহুল ঘিঞ্জি অঞ্চলে। সরু একটা গলি দিয়ে হাঁটছি, দু'ধারে
অজস্র সাদাসিধে গোছের দোকান, মনিহারী, মুদীর, এইসব। কিন্তু
সব দোকানেই লক্ষ্য করছি খুব বড় বড় বয়াম। হঠাৎ একটা দোকানে
চোখে পড়লো বিরাট বিরাট বয়ামে রাখা অত্যন্ত লোভনীয় চেহারার
হৃষ্টপুষ্ট কাজুবাদাম আর ঐরকমই বিরাট বিরাট বয়ামে নানারকম
প্রাচ্য মশলাপাতি। তাত্যানাকে বললাম, 'দেখি তো, কি কি
আছে।' দেখলাম কালো জিরা পর্যন্ত আছে! অবাক হয়ে দেখছি;
ছোকরা-মত দোকানদার এগিয়ে এলো। কৌতূহলভরে আমরা
জিজ্ঞাসা করলাম ঐ মশলাটাকে কি নামে ডাকা হয় এ দেশে।
ছোকরা লজ্জা পেয়ে গেলো, আমতা আমতা করে বললো, ফরাসীতে
কি বলে সে জানে না, তবে তাদের ভাষাতে অমুক বলে। শব্দটি
ধরতে না পারায় আরও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের
কি ভাষা?' কিন্তু সে কিছুতেই বলবে না। শুধু বলবে, 'ঐ একটা
প্রাচ্য ভাষা।' আমরা মনে মনে ভাবলাম, আরবী হবে, চেহারাতেও
খানিকটা সে ছাপ। যাই হোক, আমরা একটা ছোট প্যাকেটে কিছু
কাজুবাদাম কিনতে চাইলাম। সে দুঃখিত হয়ে জানালে যে, তার
পাইকারী দোকান, অমুক ওজনের নিচে সে বেচতেই পারে না।
আমরা একটু অবাক হলাম। বাইরে এসে হাঁটতে হাঁটতে আরও
তীক্ষ্ণ নজরে তাকালাম সারি সারি দোকানগুলোর দিকে। সাইন-
বোর্ডগুলিতে সত্যিই তো একটা অন্য ভাষা, মোটেও ফরাসী নয়।

আরে, এ যে হিব্রু হরফ! একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি আমরা। এতক্ষণ রহস্যভেদ হোলো। এ হোলো ইহুদীপট্টি, সামনে ঐ তো ইহুদীদে শূকরবর্জিত মাংসের দোকান, শাস্ত্রসম্মত উপায়ে তৈরি বড় ব সালামীর তাল ঝুলছে। পরে আমার এক ইহুদী বান্ধবীকে ঘটনাট বলি; সে উপভোগ করে বলে, 'ইহুদীরা যেখানে যায় সেখানে পাইকারী ব্যবসা শুরু করে, ব্যবসায়ী বুদ্ধি ষোল আনা কিনা! ওসব খুচরো কারবারের মধ্যে ওরা নেই। তাই তো অন্য ব্যবসায়ীরা ওদে দু' চক্ষে দেখতে পারে না!'

কিন্তু প্যারিসে তখন প্রচণ্ড গরম, খাবার জিনিস মোটে থাকছে না, মাখন-টাখন গলে যাচ্ছে; কাজেই আমাদের আরমানী মুদীর খুচরো ব্যবসাই আমাদের প্রয়োজন ঠিকভাবে মেটাতে পারতো। আন্তনভ-গৃহে রেফ্রিজরেটর ছিলো না। ফরাসীরা খুব দই খায়, বিশেষত ছাত্র-ক্যান্টিনে তো প্রায়ই দই দেয়। গরমের দিনে দইয়ের মত আর কি আছে? সাতপাঁচ ভেবে একদিন ঠিক করলাম পাড়ার দোকানে দই রাখে কিনা খোঁজ করতে হবে। যদি রাখে তবে বিশেষ সুবিধা, তা ছাড়া সামগ্রীটি সস্তা হবারই সম্ভাবনা। এদিক ওদিক তাকিয়ে যখন পরিচিত কার্টন বা শিশির হদিস পেলাম না, তখন বাধ্য হয়েই প্রশ্ন করতে হোলো।

—'মাপ করবেন মহাশয়, আপনি কি দই রাখেন?'

—'বিয়াঁ স্যর। রাখি বৈকি!' হেসে ওঠে মুদী। বুঝলাম প্রশ্নটা তার কাছে মজাদার ঠেকেছে। তার দোকানে দই থাকবে না এ যেন অভাবনীয়, আরও মজা এই যে, বড় বড় হরফে 'দই' লেখা কার্টনগুলি একেবারে আমার নাকের ডগার সামনে সাজানো। কি আশ্চর্য, আমার চোখ এড়ালো কি করে? তাত্য়ানাকে ঘটনার বিবরণী দিতে

দও হেসে ওঠে—'আমার কি মনে হয় জানো? মঁসিয়ের শাঁসালো গোঁফজোড়ার ভয়েই তুমি কাউন্টারের দিকে ভালো করে তাকাতে পারো নি, তুমি "ইনহিবিটেড" ছিলে, তাই দইয়ের পাত্রগুলি তোমার নজরে আসে নি!'

যাই হোক, এক এক কার্টনের দাম আমাদের হিসাব অনুসারে মাত্র ত্রিশ নয়া পয়সা হওয়ায় আমি সন্তুষ্ট হলাম। এর পর থেকে তৃষাতুর দুরন্ত দুপুরে আমাকে প্রায়ই দধিক্রয়ে ব্যস্ত দেখা যেতো। একদিন তাত্য়ানাকে ঘোল তৈরি করে খাওয়ালাম; অবশ্য ঘোল খাওয়ানোর বিশেষ অর্থ টি করি নি।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে বাগানে ইজিচেয়ার টেনে শুয়ে থাকতো বা কাগজ পড়তো পড়শীরা, বিশেষত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। আমি প্রায়ই সে সময়ে শহর থেকে বাড়ি ফিরতাম, পাড়ার বুড়োবুড়ীরা আমাকে চিনে গেলেন। আরমানীদের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা এখনও খানিকটা আছে। আমাকে দেখেই বুড়োরা ফেলতেন কাগজ, বুড়ীরা হাতের উল-কাঁটা। ডাক দিতেন ছেলে, ছেলের বউ, নাতিনাতনীদের। কৌতূহলী মুখে ভরে উঠতো ছোট ছোট জানলাগুলি। একটি বাড়ির একতলায় ছিলো এক ছোট্ট দরজীর দোকান, পরিচ্ছন্ন এবং ঘরোয়া, ঠিক যেরকম কলকাতায় মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে। জানলায় বসে বৈদ্যুতিক সেলাই-কলে কাজ করতো এক আশ্চর্য রূপসী; কুচকুচে কালো তার চুল, টিকলো নাক, টানা টানা কাজল-পরা কালো চোখ। তার মুখের দিকে তাকালে তার পূর্বপুরুষরা যে প্রাচ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতো না। বেশ কয়েক গজ দূর থেকে তার সেলাই কলের একটানা ঘর্ঘরধ্বনি শুনতে পেতাম, বুঝতাম সে জানলায় আছে। যখন তার জানলার সামনে আসতাম, হঠাৎ থেমে যেতো

তার কলের শব্দ। কয়েক সেকেণ্ড সব স্তব্ধ। যখন আমি তার দৃষ্টিপ
অতিক্রম করে চলে এসেছি, তখন আবার শুনতাম সেই একটা
ঘর্ঘর। একদিন চোখাচোখি হয়ে গেলো। টেবিলে এক রাশ ছাপ
সূতীর কাপড়, দেয়ালে ঝুলছে সদ্য-তৈরি-করা ফ্রক, টান করে বাঁ
খোঁপাটি, কানে এক জোড়া মোটা সোনার মাকড়ি, বিস্ময়ে স্তব্ধ হ
আমাকে নিরীক্ষণ করছে ডাগর ভ্রমরকৃষ্ণ কৌতূহলী দুটি চোখ
জুলাইয়ের তন্দ্রালু দুপুরে ম্যর্দ-র ধূলিম্লান ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উন্মীলি
পদ্মের মত সেই চোখজোড়া দেখে অভিভূতের মত উপলব্ধি করলা
রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য ঃ 'দেখেছি তার কালে
হরিণ-চোখ'। তাত্য়ানাকে পরে তাব পরিচয় শুধিয়েছিলাম
'কানে-মাকড়ি মেয়েটির কথা বলছো তো ? হ্যাঁ, আরমানী বইকি'
জানায় সে, 'ওরই তো দোকান। অপূর্ব দেখতে, তাই না ?'

আর এক দিন ঘটলো পর পর দুটি মজার ঘটনা। এক দুপু
বাড়ি ফিরছি, আমাকে দেখতে পেয়ে কোনো এক প্রতিবেশীর 'দু
কুকুর' ভৌ ভৌ শব্দে প্রচণ্ড আপত্তি জানাতে লাগলো। এরক
একজন অভাবনীয় আগন্তুক হেঁটে যাবে, অথচ কুকুর আপত্তি জানা
না, তা-ও কি হয়! দুটি ছোট্ট মেয়ে দৌড়ে এলো। আমাকে দে
লজ্জা-লজ্জা মুখে তাকিয়ে রইলো।

—'দুষ্টু কুকুর, তাই না ?' বলি আমি।

—'না না, কুকুর ভালো, শান্ত', প্রতিবাদ করে তারা, তারপ
নিজেদের মধ্যে কি যেন ফিসফিস করে। সসংকোচে প্রশ্ন করে—

—'তুমি কি আরমানী ?'

—'না।'

-'তবে, ফরাসী !'

—'না, তাও না।'

—'তবে?'

—'আমি অ্যাঁদিয়েন।'

—'অ্যাঁদিয়েন!' পরস্পর চোখাচোখি করে তারা; অভিভূত হয়ে পড়ে তাদের ছোট্ট মুখ দুটি।

—'কিন্তু তোমার পালক কই, আর তোমার তূণ, বাণ?'

মুহূর্তে বুঝতে পারি বেচারাদের অবস্থা; অ্যাঁদিয়েন বা ইণ্ডিয়ান বলতে এরা রেড ইণ্ডিয়ানই বোঝে শুধু। হেসে বলি,—'আমি আমেরিকার অ্যাঁদিয়েন নই, আমি অ্যাঁদ-এর অ্যাঁদিয়েন!' এর উত্তরে অত্যন্ত দ্রুত স্বরে তারা যা গুঞ্জরণ করে আমি তা ধরতে পারি না। হেসে বলি—'একটু আস্তে আস্তে বলো, অত তাড়াতাড়ি বললে আমি বুঝতে পারি না।'

—'কেন পারো না?'

—'আমি যে ফরাসী নই।'

—'তবে তুমি সত্যি কী?'

—'ঐ যে বললাম, অ্যাঁদিয়েন।'

—'তুমি কি সত্যিই তাই?'

—'হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই। আমি একেবারে আসল, খাঁটি অ্যাদিয়েন।'

'আসল অ্যাঁদিয়েন!' অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে তারা।

লক্ষ্য করি যেন একটা ভয়ের ছায়া ওদের মুখে এসে পড়েছে। হঠাৎ দেখি এক দৌড়ে দু'জনেই অন্তর্হিত।

তাতয়ানাদের বাড়ির সামনে এসে দেখি, কি সর্বনাশ, দরজা চাবি-বন্ধ। এখন আমি ঢুকি কি করে? শনিবারের দুপুর; তাতয়ানা

তো লাইব্রেরীতে, আর মাদাম নিশ্চয় দিবানিদ্রাভিভূত। কিন্তু কি
আশ্চর্য, এ সময়ে দরজা তো কোনোদিন বন্ধ থাকে না। তাতিয়ানা
তাই আমাকে কোনো চাবিও দেয় নি। ব্যস্ত হয়ে কলিংবেলের
অনুসন্ধান করি। চিহ্নমাত্র দেখি না। দেশী মতে যে সশব্দে কড়া
নাড়বো তারও উপায় নেই। কারণ, কড়া-ই নেই। অগত্যা জোরে
টোকা দিতে থাকি, যদিও জানি উঠান ঘর বারান্দা রান্নাঘর ইত্যাদি
পেরিয়ে বাড়ির অপর প্রান্তে বদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে মাদামের ঘুম
কখনোই সে টোকায় বিচলিত হবে না।

শেষে আমার অবস্থায় বিচলিত হয়ে একজন প্রতিবেশিনী এবং
একজন পথচারিণী এগিয়ে আসেন।

'তুমি তো মাদাম আস্তনভের অতিথি, তাই না? আচ্ছা দাঁড়াও,
আমাদের বাগানের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা আছে, সেটা থেকে
মাদামের শোবার ঘর দেখা যায়, আমি হাঁক পেড়ে দেখি।'
প্রতিবেশিনী অন্তর্হিত হন।

পথচারিণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আলাপ করতে থাকেন—'তুমি কি
আলজেরীয়?'

অগত্যা পুনরায় আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হই।

—'ভারতীয়? ভারতবর্ষে আমি কখনও যাই নি, তবে আমার
স্বামী যুদ্ধের সময় গিয়েছিলো। আমি শুধু আলজেরিয়ায় গিয়েছি।
প্রাচ্য বলতে সেখানকার ছবিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তোমার
বয়স কত? তেইশ? আহা, এই বয়সেই মারা গিয়েছিলো আমার
মেয়ে। ঠিক তোমার মত দেখতে। হ্যাঁ, অবাক হোয়ো না, প্রায়
তোমার মতই বাদামী রঙ, ঠিক এই মুখের গড়ন, একেবারে তোমার
মতন।'

মুগ্ধ নেত্রে আমাকে দেখতে থাকেন ভদ্রমহিলা, এবং সস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাতে থাকেন। ইতিমধ্যে হাঁকাহাঁকিতে মাদাম ঠেছেন। হাসতে হাসতে দরজা খোলেন।

—'লজ্জিত, দারুণ লজ্জিত। ঘুমাবো না পণ করা সত্ত্বেও কখন য ঘুমিয়ে পড়েছি। আজ হঠাৎ খেয়াল হয়েছিলো যে, সদর দরজা না লে শোয়াই ভালো। যা দিনকাল হয়েছে আজকাল। বিশেষত পরে তোমার শাড়ি-টাড়ি রয়েছে, কখন কে একটা টেনে নয়ে যায়।'

এই সুযোগে পথচারিণী মাদামকে প্রশ্ন করেন—'আপনিই াদাম আস্তনভ? আপনার বাড়ির একটা ঘর আপনি মিস্ত্রীদের খনও কখনও ভাড়া দেন না? কাগজে যেন বিজ্ঞাপন দেখেছি?'

—'হ্যাঁ, দিই বটে, তবে এখন সেটা খালি নেই, ভাড়া হয়ে গছে।'

—'আচ্ছা, ধন্যবাদ।' আবার আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ রে বিদায় নেন মহিলা।

অতঃপর প্রশ্নের পালা আমার। মাদাম দরজায় একটা ঘন্টি বান নি কেন? সশব্দে হেসে ওঠেন মাদাম—'ঘন্টি আছে, তবে কউ সেটা দেখতে পায় না, কারণ ঘন্টির রঙ দরজার রঙ একই। এই াখো।'

সবিস্ময়ে দেখলাম সত্যিই তাই। একবার দেখিয়ে না দিলে কার াধ্য যে, সে চিনে বার করে। কালো দরজার গায়ে বেশ খানিকটা চুতে একেবারে দরজার গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে আছে ছোট বাতামটি, দরজা রঙ করবার সময় কোনো অতিবুদ্ধিমান মিস্ত্রী সযত্নে বাতামটির উপরেও তার বুরুশ বুলিয়ে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যায় তাত্‌য়ানা ফিরতে তাকে সব বলি। রেড-ইণ্ডিয়ান প্রসঙ্গে খুব হাসে তাত্‌য়ানা—'তোমাকে তো বলাই হয় নি, তোমাকে দেখার পর থেকে বেশ হতাশ হয়েছে পাড়ার খোকাখুকুরা। তোমার পালক নেই, তূণ নেই, ধনুক-বাণ নেই। তুমি আবার কেমন ইণ্ডিয়ান! ইণ্ডিয়ান আসবে শুনে ওরা কত কল্পনা করে রেখেছিলো। তোমার সঙ্গে তার একটুও মিল হোলো না। টেলিভিশনে রেড-ইণ্ডিয়ান দেখে দেখে এমন হয়েছে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা ইণ্ডিয়ান বলতে শুধু তাই বোঝে। তাই তুমি যখন "আসল ইণ্ডিয়ান" বলেছো, তখন ওরা ভেবেছে, "সর্বনাশ, তবে যা শুনেছিলাম তাই ঠিক। তীর-ধনুক না থাকলে কি হবে, আসল জিনিস তো। কি জানি কখন কোথা থেকে তীর বার করে, হয়তো ব্যাগে লুকিয়ে রেখেছে, হঠাৎ চটেমটে ছুঁড়ে দেয় যদি? শীগগির পালা, একে না ঘাঁটানোই ভালো।" '

মাদাম যে ভাড়া দেওয়া ঘরটির কথা বলেছিলেন সেটি ছিলো ঢুকতেই বাঁ দিকে। ফলকে লেখা 'প্রবেশ নিষেধ' এবং দরজায় ঝুলন্ত এক বিরাট মরচে-পড়া তালা। প্রায়ই ভেবেছি তাত্‌য়ানাকে জিজ্ঞাসা করবো ঘরটা কাদের ভাড়া দেওয়া হয়েছে; একদিন এক মজার ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেই জানতে পারলাম।

এক বিকেলে কেউ বাড়ি নেই। লক্ষ্য করলাম উঠানের দড়িতে ঈষৎ-আর্দ্র যেন দুটি শাড়ি ঝুলছে। অবাক হয়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে আসতে বুঝলাম শাড়ি নয়, যদিও শাড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ছাপানো রেশম। তখনই অনুমান করলাম ভাড়া-দেওয়া ঘরটির সঙ্গে এই রেশমের কোনো যোগ আছে। সম্ভবত রেশম হাতে ছাপানোর জন্য কোনো কুটিরশিল্পী ভাড়া নিয়েছে। মনে মনে কাপড় দুটির ছাপের তারিফ করছি, এমন সময়ে চমকে উঠলাম ভারী

পুরুষকণ্ঠের সম্ভাষণ শুনে।

—'শুভ দিন।'

অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখি দু'জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সম্ভাষণ-বিনিময় করলাম।

—'আমাদের কাপড় পছন্দ হয়?'

—'হ্যাঁ, কাপড়ের তারিফই করছিলাম।'

—'অনেকটা আপনার পরনের কাপড়ের মত। তাই না?'

—'তাই তো দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।'

—'আপনি তো হিন্দু, তাই না? আপনার পোশাক দেখে মনে হয়।' থেমে থেমে জানালাম, 'হ্যাঁ, আমি হিন্দু বটে, তবে সেটা আমার প্রথম পরিচয় নয়। প্রথম পরিচয়ে আমি ভারতীয়। হিন্দু হোলো ধর্মের বিশেষণ আর ভারতীয় দেশের। আমি হিন্দু না হয়ে ভারতবর্ষের খ্রীষ্টান বা মুসলমান মেয়ে হতে পারতাম, আমার শাড়ি দেখে আপনারা কিছুই বুঝতে পারতেন না, কারণ সবাই শাড়ি পরে।'

ভদ্রলোক দু'জন লজ্জিত হলেন।

—'মাপ করবেন, মাপ করবেন, এই "অ্যাঁদু" আর "অ্যাঁদিয়াঁ"-তে বড় গুলিয়ে যায়। আমরা শেষেরটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। সংজ্ঞা দুটির পার্থক্য আমাদের অজানা নয়।'

আসলে ফরাসী দেশে indien বা অ্যাঁদিয়াঁ (স্ত্রীলিঙ্গে indienne বা অ্যাঁদিয়েন) বলতে সর্বপ্রথমে রেড ইণ্ডিয়ানই বোঝায়। প্যারিসের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিষয়ক প্রদর্শনাগারে সবত্র এই ব্যবহার লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হয়েছি। ভারতীয় বোঝাতে তারা সাধারণত ব্যবহার করে hindou শব্দটি এবং এই অশুদ্ধ ব্যবহার শিক্ষিতদের

মধ্যেও বহুপ্রচলিত। একাধিক জায়গায় আমাকে বোঝাতে হয়েছে যে, সব indien-ই hindou নয়। তাত্য়ানা বলে শব্দ দুটির এই বিভ্রান্তিকর ব্যবহার নাকি ১৯৪৭ সালের পর থেকে কমেছে এবং ভারতীয় বোঝাতে indien-এর প্রয়োগ ক্রমশ বাড়ছে; তরুণেরা নাকি এ ধরনের ভুল করে না।[১]

এদিকে ম সিয়ে-যুগল বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে তাকিয়েই আছেন।

১. বহু বছর বাদে এ লেখা আবার পড়তে বসে বুঝতে পারছি যে এ কথাটা যোগ করা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভারতীয় বোঝাতে Hindu অথবা hindou শব্দের প্রয়োগকে ঠিক অশুদ্ধ বলা চলে না, বলা চলে প্রাচীনপন্থী। উৎপত্তি ও মূল অভিধার নিরিখে Indian ও Hindu বস্তুত একই শব্দ: দুয়েরই উৎস এক, এবং নিহিত সেই অতীতে যখন ভারতে মুসলমান উপস্থিতি ছিলো না। প্রাচীন ইরানীদের দৌলতে সিন্ধুনদ-তীরবর্তী মানুষেরা এই নামে পৃথিবীতে পরিচিত হয়। ক্রমশ প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজীতে Hindu ও Indian শব্দ দুটির ঈষৎ অর্থতারতম্য গড়ে উঠেছে। এদিকে কলম্বসের বিভ্রান্তির পর থেকে 'ইণ্ডিয়ান' শব্দটিরও দুটো মানে গড়ে উঠেছে, যে-সমস্যাটি এড়াতে গিয়েই ফরাসীরা hindou শব্দটিকে রেখেছিলেন 'ভারতীয়' বোঝাতে। কিন্তু ক্রমশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায় অর্থে ইংরেজীতে 'হিন্দু' শব্দটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়লো এবং এ অর্থে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। এ কারণেই ফরাসী কায়দায় hindou শব্দটির ভৌগোলিক অর্থে প্রযোগ আজকের দিনে বিসদৃশ ঠেকে। ফরাসীভাষীরা হয়তো ক্রমশ তাদের প্রয়োগ বদলাবে: এটা ফরাসী ভাষার বিবর্তনের প্রশ্ন। এ জাতীয় সমস্যা সব ভাষাতেই থাকে। আমেরিকার আদিবাসীদের বোঝাতে Amerindian শব্দটির ব্যবহার অন্তত ইংরেজীতে ক্রমশ বাড়ছে, এবং যাথার্থ্যের খাতিরে এই শব্দটির ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে 'ইণ্ডিয়ান' শব্দটির দ্ব্যর্থবোধকতার সমস্যাটার খানিকটা সুরাহা হবে। —কে. কু. ডা., ১৯৮

—'মাপ করবেন। আমরা এরকমভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি :কন জানেন? এত কাছ থেকে অ্যাঁদিয়েন কখনো দেখি নি বলে। ভারতীয় পুরুষ অবশ্য দেখেছি, কিন্তু ভারতীয় নারী দেখেছি খুব দূর :থকে, বা ছবিতে বা ফিল্মে। আজ এইরকম চোখের সামনে বাস্তব রূপায়ণ...' লজ্জায় কথা শেষ করতে পারেন না। আমি হেসে অবস্থাটা হাল্কা করার চেষ্টা করি। তাঁরা আমাকে আহ্বান জানান —'আসুন না, আমাদের কাজের ঘরটা দেখে যান না। আমাদের সামান্য আতলিয়র (স্টুডিও) ধন্য হোক।'

অগত্যা প্রবেশ করি, কিন্তু দরজার কাছেই থাকি।

—'এই দেখুন আমাদের সব রঙ। ঘরটার ছিরি দেখেছেন, বড্ড অগোছালো। নারীর কল্যাণ-হস্তের প্রয়োজন! কি বলুন?'

মনে মনে ভাবি সেয়ানা আছেন মঁসিয়েদ্বয়। তাঁরা বলে যেতে থাকেন—'আপনার মত দয়াশীলা কেউ যদি সাহায্য করতেন কত সুষ্ঠুভাবে করা যেতো শিল্পচর্চা।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কতদিন যাবৎ কাপড় ছাপানোর কাজ করছেন?' একজন বলেন, 'কাজটা আমারই প্রধানত। আর ইনি আমার পার্টনার। এই কাজ আমি করছি মাত্র বছর দুয়েক। এর আগে আমি আইনব্যবসায়ী ছিলাম, কিন্তু সে পেশা ভালো লাগতো না। তাই ছেড়ে দিলাম। তারও আগে আমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম। আচ্ছা আপনি নিশ্চয় ইংরেজী জানেন?'

ভদ্রলোকের পেশা পরিবর্তনে চমৎকৃত হয়ে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ জানি বই কি। আমি ইংরেজীরই ছাত্রী। তিন বছর অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে হয়েছে, দেশে ফিরে যাবার আগে প্যারিসে বেড়াতে এসেছি।'

—'অক্সফোর্ডে!' নামটা মন্ত্রের মত কাজ করে! মুগ্ধ হন দুজনেই
—'তবে সেখানেই কি…'

—'হ্যাঁ, সেখানেই মাদাম আস্তনভের মেয়ের সঙ্গে আলাপ এব সে সূত্রেই এই বাড়িতে থাকা।'

এবার শিল্পিদ্বয়ের নেতা সলজ্জকণ্ঠে ইংরেজীতে কথা বলতে শুরু করেন।

—'ইংরেজী আমিও একটু একটু বলতে পারি। এই দেখুন না। তবে ছাত্রবয়সে আরও ভালো পারতাম।'

—'না না, কি বলেন, আপনি তো চমৎকার ইংরেজী বলেন দেখছি।'

—'আপনার মত কি আর ভালো। আপনারা তো বাড়িতে ইংরেজীতেই কথা বলেন, নয় কি?'

—'না না, ইংরেজী আমরা স্কুল থেকে শিখি, শিখতে বাধ্য হই। বাড়িতে আমরা মাতৃভাষাতে কথা বলি। আমার মাতৃভাষা বাংলা। ইংরেজী আমাকেও কষ্ট করে শিখতে হয়েছে।' (আমাদের দেশের ড্যাডি-মামী-ওয়ালাদের কথা অবশ্যই কিছু ফাঁস করলাম না, সেসব লজ্জার কথা বলতে যাবো নাকি বিদেশীদের কাছে?)

'আপনি তবে বাঙালী?' ওঁদের চোখ থেকে আরও আনন্দ, আরও বিস্ময় ঠিকরে পড়তে থাকে, 'বাংলাদেশ সম্বন্ধে শুনেছি কত গল্প, কত বর্ণনা। একজন বাঙালী মহিলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হোলো, এ আমাদের অসীম সৌভাগ্য। আচ্ছা, আপনি "বাংলাদেশের রাত্রি" নামে একটা ফরাসী উপন্যাস পড়েছেন কি?'[২]

---

২. এখানে নিশ্চয়ই Mircea Eliade-এর La Nuit Bengali উপন্যাসটির কথা বলা হচ্ছে, যে-প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী পরে লিখেছেন তাঁর

জানাতে বাধ্য হই যে, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি। যিনি কথা
ছিলেন তিনি জানান—

'বইটার কেন্দ্রিক সমস্যা হোলো একজন ফরাসীর সঙ্গে এক
ঙালী মেয়ের প্রেম। সমাজের দিক থেকে আসছে প্রচণ্ড বাধা।
য়ারোপীয়ের সঙ্গে বিবাহ মেয়েটির সমাজ অনুমোদন করতে চাইছে
। আচ্ছা, আপনিই বলুন, এ চিত্র কি যথাযথ? ইয়োরোপীয়ের
ঙ্গ সম্ভাব্য বিবাহে বাংলার সমাজের এটাই কি প্রত্যাশিত
তিক্রিয়া?'

এ প্রশ্ন তো সহজ নয়। জানাই যে, এর কোনো একটি মাত্র
বাব দেওয়া সম্ভব নয়। উক্ত নায়িকা সমাজের কোন স্তরের অন্তর্ভুক্ত,
টনার স্থান ও কাল কোথায়, এসবের উপর নির্ভর করে; তবে
ন্দো-ইয়োরোপীয় বিবাহ মধ্যে মধ্যে ঘটে এবং শিক্ষিত সমাজে
হীত হয় বলেই জানি। হঠাৎ প্রশ্ন আসে—'আচ্ছা, আপনি হলে কি
রতেন? আপনি নিজে কি ইয়োরোপীয়কে বিয়ে করতেন?'

—'বিঁয়া স্যুর! প্রেমে পড়লে নিশ্চয় করতাম। শুধু ইয়ো-
রোপীয় কেন, যে-কোনো দেশের লোককেই করতাম!'

সপ্রশংস নেত্রে তাকান তাঁরা, আমার উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তুষ্ট
য়ে গুঞ্জরণ করেন—'মাপ করবেন এই অশোভন কৌতূহল, কিন্তু
াপনাকে কি বলে ডাকবো, মাদাম না মাদমোয়াজেল, মানে
াপনি কি বিবাহিতা?'

—'না, আমি বিবাহিতা নই, আমাকে মাদমোয়াজেল বলেই
াকবেন।'

: হস্ততে' বইটি। এমিগ্রে রুমানী কুটিবশিল্পী দুজনকার সাথে আমার এই
থাবার্তার তারিখ ১৯৬৩।

—'আচ্ছা মাদমোয়াজেল, আপনি যে বললেন ইয়োরোপীয় প্র
বিয়ে করতে আপনার আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি কি ধর্মান্তর গ্রহণ
করতে রাজী? আপনার স্বামী খ্রীষ্টান হলে আপনি কি করতেন?'

—'স্বামীর ধর্ম স্বামীর থাকতো, আমার ধর্ম আমার থাকতো।
রেজিস্ট্রি বিয়ে করতাম। আমার ধর্ম আমি ত্যাগ করতাম না।'

—'আচ্ছা ধরুন আপনার স্বামী রোমান ক্যাথলিক। সে ম
করে তার পন্থাই একমাত্র সত্য পন্থা। সে চায় তার স্ত্রীও একধর্মা
লম্বী হোক। নিদেনপক্ষে সন্তানকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। সে
ক্ষেত্রে আপনি কি করতেন?'

—'সেরকম একদেশদর্শী লোকের প্রেমেই আমি পড়তাম না! তা
ছাড়া সন্তানদের শৈশব থেকে কোনো এক বিশেষ মন্ত্রে দীক্ষিত না
করাই প্রশস্ত। সব পন্থা সম্বন্ধে জানতে পড়তে দিলে নিজেরাই বিচার
করে নিতে পারবে। ভগবান যদি থাকেন, আপনারা নিশ্চয় মানবে
যে তিনি এক। আজকের দিনে এ প্রসঙ্গ নিয়ে ঝগড়া অর্থহীন। স
জীবনযাত্রার নীতিসমূহ সব দেশেই এক; সৎ জীবনই সৎ ধর্ম, তা
নয় কি?'

—'ঠিক ঠিক, খাঁটি কথা। কিন্তু মাদমোয়াজেল, এক মিনিট
দাঁড়ান দেখি। আমার যেন চিন্তা একটু গুলিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কি যে
বলছিলাম। মাদমোয়াজেল, আপনার কি মনে হয়, ধর্ম বড় না প্রেম
বড়?'

—'দেখুন মঁসিয়ে, আমার জীবনে সেরকম কোনো দ্বন্দ্ব নেই,
কারণ আমার আগের উক্তি থেকেই বুঝতে পারছেন যে ধর্ম বলতে
আমি কোনো একপেশে বিশ্বাসকে বুঝি না, বুঝি সৎ জীবন। প্রেম
সৎ জীবনেরই অংশ, সুতরাং দ্বন্দ্ব কোথায়? সংকীর্ণ ধর্মের চাইতে

প্রম নিশ্চয়ই বড়। ধর্ম আব প্রেম, দুয়েব সংজ্ঞা যথার্থভাবে বুঝলে :বোধ থাকা উচিত নয় মনে করি।'

—'আপনি যথার্থই উদাব, মাদমোয়াজেল। ফরাসীরা আপনার ভিমত শুনে কি বলবে জানি না, কিন্তু আপনি আমাদেব শুভেচ্ছা হণ করুন।'

অবাক হয়ে শুধাই, 'আপনারা ফরাসী নন? তবে কি আরমানী?'

—'না, মাদমোয়াজেল। আমরা রুমানী। রুমানিয়া আমাদের াতৃভূমি। আমরা উদ্বাস্তু, এমিগ্রে। আমাদের শরীরে বেদের রক্ত াছে। আমাদের কালো চুল এবং চোখ লক্ষ্য করুন। বোধ করি ামাদের পূর্বপুরুষেরা ভারতবর্ষ থেকেই এসেছিলেন।' তাঁদের চুল বং চোখের রঙ আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। সহানুভূতির স্বরে ললাম, 'আমার পূর্বপুরুষেরাও বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন,' বং ইংরেজী ফরাসী মিলিয়ে দেশ বিভাগের একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা বলাম।

ঝনাৎ শব্দে দরজা খুলে মাদাম আস্তনভ বাড়ি ফিরলেন।

—'শুভ দিন, শুভ দিন, মহাশয়গণ। আমাদের অতিথির সঙ্গে ল্প হচ্ছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ মাদাম, মাদমোয়াজেলের সঙ্গে আলাপ করে আমরা ত্যন্ত আনন্দিত। ওঁকে বলবেন আবার এসে আমাদের সঙ্গে গল্প বতে।'

—'নিশ্চয় বলবো। কিন্তু আপনাদের কাজ কেমন চলছে, কোনো সুবিধা নেই তো? বেশ বেশ।'

আবার তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে আমার কোনোই আপত্তি ছিলো া, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁদের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নি।

॥ ছয় ॥

প্রতিবেশী আরমানী পরিবার মিনাস-দের সঙ্গে আস্তনভদে
বিশেষ যোগাযোগ ছিলো। পাশাপাশি বাড়ি এবং উঠোন। মা
শুধু বেড়া। আমাদের এদিকে অযত্নবর্ধিত ঘাস; ওঁদের ওদি
ছিমছাম তরিতরকারির বাগান, মাচা, চারায় জল দেবার জন্য পাইপ
আরও কত কি। বাগানের এক কোণে একটি অস্থায়ী তাঁ
বাচ্চাদের নিদাঘপ্রমোদের জন্য। মিনাস-রা যৌথ পরিবার। এখ
যাঁরা বুড়ো-বুড়ী তাঁরা এসেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে, কোনো মতে মা
গুঁজবার জন্য একটা একতলা বাড়ি তুলে নিয়েছিলেন, আর বাগা
লাগিয়েছিলেন শশাটা বেগুনটা। তাঁদের একমাত্র সন্তান আ
জোয়ান হয়েছে, শহরে তার মস্ত জুতোর দোকান। একতলার উপ
ছেলে দোতলা তুলেছে, আব তার সঙ্গে এনেছে আধুনিক পাশ্চা
জীবনযাত্রার সমস্ত সরঞ্জাম—গাড়ি, রেফ্রিজরেটর, বৈদ্যুতিক চুল্লী এব
অন্যান্য যন্ত্র-সংবলিত রান্নাঘর। ছেলের বিয়ে বাপেই দিয়েছিলে
যথাসময়ে। ঘরে এনেছিলেন টুকটুকে বউ। আজ আর কোনো দুঃ
নেই তাঁর, নেই কোনো দৈন্য, কোনো ক্লেশ। স্ত্রী, ছেলে, ছেলে
বউ, নাতিনাতনীদের নিয়ে জীবনের সায়াহ্নে এখন শুধু অবসরযাপন
সারা সকাল বাগানে খুটখাট করেন বুড়ো মিনাস। মাটি খোঁড়ে
জল ঢালেন, মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেন তাঁর চারাদে
বৃদ্ধি, মোটা মোটা গোল গোল লেটুসদের বাহার দেখে নিজে

জান্তে হেসে ফেলেন, সযত্নে হাত দিয়ে শিশির ঝেড়ে দেন। কখনো
তৈরি করবেন শখের ডিঙিনৌকা, নাতিনাতনীরা নৌকা বাইবে
য়না তুলেছে। মাদাম আস্তনভের সঙ্গে দেখা হলেই একগাল
াসি। কখনো হয় সুখদুঃখের কথা, কখনো বা বেড়ার উপর হাত
াড়িয়ে মাদামের দিকে এগিয়ে দেন এক থোলো তাজা লেটুস।
খনো লক্ষ্য করি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অথচ জোর দিয়ে আঙুল নেড়ে
ড়ে কি যেন বোঝাচ্ছেন। ভাষা আরমানী, বুঝতাম না কিছুই,
বে এটুকু বোঝা যেতো যে, কোনো একটা ব্যাপারে তর্কের এদিক-
দিক সব গুছিয়ে ধাপে ধাপে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। ওঁদের কথাবার্তা
থকে প্রায়শ ব্যবহৃত দুটি শব্দ মনে আছে: 'আইও' আর 'দা'।
দ্ধ বিস্মিত মুখে হয়তো বলছেন, 'আইও!' বা তাঁর নাতিদীর্ঘ
কানো ভাষণের পর মাদাম গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলছেন, 'দা,
া।' 'দা' মানে যত দূর মনে আছে 'হ্যাঁ'।[১] 'আইও'-র ঠিক মানেটি
ামার আর মনে নেই, তবে সেটিও অনুরূপ কোনো অব্যয়-শব্দ।
ামাকে দেখে বৃদ্ধ মিনাস যে অবাক হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

১. এ অংশ লেখবার পর জানলাম যে, 'দা' হচ্ছে রুশ 'হ্যাঁ'। শব্দটি
ারমানীতেও আছে কিনা কে জানে। তবে মিনাস বা মাদাম আস্তনভের
ক্ষে আরমানী ভাষায় কথাবার্তা চালাতে চালাতে থেকে থেকে এরকম দু' একটি
শ শব্দ মিশিয়ে দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইংরেজী জানে না এমন কোনো লোক
দি বাঙালীদের কথাবার্তা শোনে, তবে তার কি মনে হবে না যে, 'ফাইন' বা
াট আপ' বিশুদ্ধ বাংলা? 'অল রাইট ভেরি গুড। পাঁউরুটি বিস্কুট', এই
াইন দুটির যথাযথ শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট স্থানের অপেক্ষা রাখে।

['দেশ'-এ এ অংশটি প্রকাশিত হবার পরে 'আইও' শব্দটির মানে জানিয়ে
কজন আমাকে চিঠি লিখেছিলেন মনে পড়ছে, কিন্তু পুরোনো কাগজপত্রের
প ঘেঁটে সে চিঠি খুঁজে বার করাও দুঃসাধ্য!

দাম আবার তাঁকে ইন্দো-ইয়োরোপীয় পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে
।নদান করতে লাগলেন। মিনাস একবার তাঁর কথা শোনেন,
।র একবার তাকান আমার দিকে, আর হাসিমুখে বলেন 'দা,
।' আরমানীরা তাদের ইন্দো-ইয়োরোপীয় উৎস সম্বন্ধে অতিমাত্রায়
চতন, সেই উৎসের 'ইন্দো' অংশটির একজন জলজ্যান্ত আধুনিক
তিনিধিকে দেখে পুলকিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বুড়ী মিনাস ছিলেন রোগাটে। এপ্রন পরে সারাটি সকাল তিনিও
।হায্য করতেন স্বামীকে। এসব তাঁদের শখের কাজ, সময়
।টানোর জন্যে মাত্র। বিকেলের দিকে কর্তা সহ রোয়াকে বসে
।তিনাতনীদের সঙ্গে গল্প করতেন। সারা দিনই থেকে থেকে বাগান
।কে হাঁক পাড়তেন পুত্রবধূর উদ্দেশে: 'এলি—জ! এলি—জ!'
মনি দোতলার বারান্দায় এলিজের আবির্ভাব: 'কী, মা?'

এলিজ মেয়েটি ছিলো ভারী মিষ্টি। বছর আটাশ-উনত্রিশ বয়স।
।স্থ্যে ভরপুর নিটোল দেহ, গৌর পুষ্ট বাহু দুটি কার্নিশে ভর দিয়ে
সে দাঁড়াতো। যতদিন দেখেছি সর্বদাই পরনে বগল-কাটা সূতীর
ক, হয়তো ওর নিজের হাতেই বানানো, কাজকর্মের সময় কোমরে
।ট করে বাঁধা ধোপদুরস্ত সাদা এপ্রন। কুচকুচে কালো চুল
।কড়া-কোঁকড়া, ঘাড়ের উপর গুচ্ছ গুচ্ছ নেমে এসেছে। টান করে
তে দিয়ে কখনো কখনো বেঁধে রাখতো, কিন্তু কপালে, কানের
।ছে, অবাধ্য অলক উড়তে থাকতো। ডাগর কালো চোখ দুটি
।রও বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। যতবার
খতাম, মনে মনে আওড়াতে বাধ্য হতাম:

'মুখখানি মিষ্টি রে
চোখ দুটি ভোমরা

ভাবকদমের—ভরা
রূপ ভ্যাখো তোমরা।'

তাতিয়ানার কাছে শুনেছিলাম কোনো আরমানী অন্ত্যে
ক্রিয়ায় সমাধিক্ষেত্রে কিশোরী এলিজকে দেখেছিলেন প্রৌঢ় মিনা
তখনই খোঁজখবর করেছিলেন মেয়েটি কার ইত্যাদি। পরে জিজ্ঞ
করেছিলেন ছেলেকে, 'সকালে গোরস্থানে কালো পোশাকে
মেয়েটিকে দেখেছিলে, পছন্দ হয়?' ছেলে জোজোর আপত্তি ছি
না। অতএব, শুভস্য শীঘ্রম। বাপ-বেটা উভয়েই যে যথার্থ পরিণ
দর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ এলি
মত কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী খুব কমই হয়। উপরন্তু, এলিজ ছিলো প্র
বুদ্ধিমতী, তার চোখমুখ থেকে নারীসুলভ উপলব্ধির দ্যুতি ঠি
পড়তো। চোখ তুলে সোজা চাইতো, উত্তর দিতো আগ্রহ সহকা
তার ব্যবহারে মাধুর্য এবং ছন্দ ছিলো, কিন্তু ছিলো না অহে
সংকোচ বা আড়ষ্টতা। সংসারের সব কাজ সে নিজেই করতো,
চাকরের বালাই ছিলো না। খোলা সিঁড়িটা দিয়ে সারা দিন তর
করে উপর-নিচ করতো। সন্ধ্যায় ফিটফাট হয়ে স্বামীর সঙ্গে বেড়া
বেরোতো তাদের দশভো গাড়িটি করে।

স্বামী জোজো ছিলো মজাদার মানুষ। কৌতুকপ্রিয়। স
বাগিয়েছিলো গোঁফজোড়াটি। আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থে
বেড়ার ওপাশ থেকেই অনর্গল চালাতো ঠাট্টা-তামাশা। ছুটির
দুপুরের দিকে হয়তো খুব রোদ উঠেছে, দেখি মঁসিয়ে জোজোর ঊর্ধ্ব
অনাবৃত, বাগানে জল দেবার পাইপটি নিয়ে দিব্যি স্নান হচ্ছে।

—'ও মঁসিয়ে, আপনাদের স্নানের ঘরে কি ঝাঁজরি নেই?'

—'আছে বইকি। কিন্তু এই উদার রোদ ফেলে ঠাণ্ডা বাথরু

যায় ? প্রকৃতির বুকে স্নানই শ্রেষ্ঠ।'

একমত না হয়ে উপায় নেই। তৎক্ষণাৎ—

—'আপনিও আসুন না মাদমোয়াজেল। যোগদান করুন।'

—'এত বেশী মস্করা ভালো নয়, মঁসিয়ে', চোখ পাকিয়ে বলি
।মি।

—'ফরাসীতে আমরা বলি "তাকিনে" মানেই "এইমে", ঠাট্টা
়তে পারাই প্রীতির লক্ষণ।' নিরুদ্বেগে জবাব দেয় জোজো মিনাস।
রান্দায় এলিজ খিলখিল করে হেসে ওঠে।

তাত্য়ানাদের টেলিফোনটিতে একটি লুক্কায়িত কব্জা ছিলো,
টিকে না টিপলে সংযোগস্থাপন হোতো না। অথচ সেটি ছিলো
তই গোপন যে, বাইরের কারও বুঝবার উপায় ছিলো না, অনেকটা
দের দরজার ঘন্টির বোতামের মতই। একদিন দুপুরে কেউ বাড়ি
ই, টেলিফোন বেজে উঠলো। আমি ধরেছি এবং সম্বোধন করে
লছি, অপর পক্ষও তথৈবচ। বুঝলাম কানেকশন হচ্ছে না। তখনই
ানো কব্জা আছে সন্দেহ করে টেলিফোনটির গাত্র তন্নতন্ন করে
জলাম, কিন্তু বিফল হলাম। অগত্যা ফোন ছেড়ে দিতে হোলো।
নি ফোন করেছিলেন তিনি আরও দুবার কল করলেন। আমি
ারীতি উত্তর দিলাম, কিন্তু কানেকশন হোলো না। উঠানে এসে
খি বেড়ার ওধারে বুড়ী মিনাস কাজ করছেন। ব্যাপারটা তাঁকে
লাম। তিনি ছিলেন আমার সামনে বিশেষ লজ্জাশীলা। আমাকে
াজাসুজি কোনো জবাব না দিয়ে তিনি ডাকতে শুরু করলেন,
লিজ, এলিজ!' বারান্দায় এলিজের আবির্ভাব। এলিজকে আবার
লাম। সে বললো—'সে কি! ফোন তুলে হ্যালো বললেই তো
ল। কি আশ্চর্য। আচ্ছা, আবার যদি বাজে, আমি দৌড়ে

আসবো। কিন্তু জিজি-বুদাকে সামলাবে কে?'

—'ভয় নেই, জিজি-বুদা রান্নাঘরে বন্ধ আছে, কিচ্ছু করবে না
ফোন অবশ্য আর আসে নি, কিন্তু এলিজের সঙ্গে সেই আমার প্রত
সংলাপ। সন্ধ্যায় তাত্য়ানা আসতে তাকে সব বললাম। প্রথ
তাত্য়ানাও অবাক।

—'কজা? কই আমাদের ফোনে তো সেরকম কিছু নেই—'

—'নয় তো কানেকশন হোলো না কেন শুনি? তুমি বলতে চা
ত্রুটি ও তরফ থেকেই? অপর পার্টিই কোনো বোতাম টিপতে ভু
করেছিলেন?'

হঠাৎ মনে পড়ে তাত্য়ানার। হ্যাঁ, আছে বইকি। টেলিফোনটা
নিচে। টেলিফোন আর টেবিলের মাঝে সরু ফাঁকটিতে আঙু
খুঁচিয়ে সেটাকে ক্লিক করতে হয়। এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে, সে
যে অসাধারণ তাও মনে থাকে না।

শিগগিরই একদিন এলিজ-রা আমাদের সন্ধ্যায় কফির নিম
করলো। সেদিনই দেখলাম কি পরিপাটি তার সংসার, কি গুছা
তার রান্নাঘরটি, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কি তার যত্ন। ছোট্ট এক
পানপাত্রে এলিজ আমাকে এক ফোঁটা পানীয় দিলো—আরমা
মদ। তাতে মৌরী মৌরী গন্ধ।

—'আমি জানি, তোমার ভালো লাগবে', হাত ঘুরিয়ে বলে সে
কেমন করে তাকে জানাই আমার মনের কথা?

'সাহেব বলেছেন যেতে
পানসুপারি খেতে,
পানের আগায় মৌরীবাটা,
ইস্কাবনের চাবি আঁটা।'

টান করে বাঁধা এলিজের চুল, পিছনে ঘোড়াব লেজ স্টাইল। সবই মিলে যাচ্ছে!

'চুল-টানা বিবিয়ানা,
সাহেব-বাবুর বৈঠকখানা।'

এদিকে জোজো উঠে-পড়ে লেগেছে আমার শাড়ি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে। প্রথমে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য সহকারে—'মাদমোয়াজেলের পায়ে কি কোনো ক্ষতচিহ্ন-টিহ্ন আছে নাকি?'

—'না তো, কেন বলুন তো?'

—'তবে সর্বদা ঐ লম্বা পোশাকে পা ঢেকে থাকেন কেন?'

তাত্য়ানা আমার সাহায্যে আসে এবং শাড়ির উপর একটি ছোটখাট জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেয়। শাড়ি যে দর্জির তৈরী কোনো পোশাক নয়, বস্ত্রখণ্ড মাত্র, তা জেনে জোজো-এলিজ উভয়েই চমৎকৃত। আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখে। থেকে থেকে অস্ফুট গুঞ্জন করে। অবশেষে জোজো মন স্থির করে ফেলে,—'বুঝলে এলিজ, তোমাকে একদিন শাড়ি পরতে হবে। তুমি পরবে মাদমোয়াজেলের একটা শাড়ি, আর ওঁকে দেবে তোমার একটা ফ্রক।'

আমি তো সর্বদাই রাজী। কিন্তু জীবনের আরও অন্যান্য মজার পরিকল্পনার মত এ পরিকল্পনাটাও আমার হ্রস্ব ম্যদঁবাসের মধ্যে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবার সুযোগ পায় নি।

জোজো এক বিকালে আমাদের ভার্সাই-এর প্রাসাদে নিয়ে গেলো। দিনটা রোদে রোদে একবারে তেতে উঠেছিলো; ভার্সাই-এর প্রাসাদে আর উদ্যানে ভিড় করেছিলো ইয়োরোপীয় পর্যটকেরা। ইয়োরোপের যাবতীয় দেশের লোক এসেছিলো দলে দলে। আমাকে একসঙ্গে এত অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখীন হতে হোলো

যে আমাব নিজের বেড়ানোর আনন্দই গেলো প্রায় শুকিয়ে। মানতে
বাধ্য হলাম যে, জনাবণ্যের কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু আমার পক্ষে
সেই শতমুখ কৌতূহল নিতান্ত অস্বস্তিকর হয়ে পডলো। নিজেই
চিড়িয়া হয়ে পড়লে চিড়িয়াখানা দেখবার সুখটি আর থাকে না।
মনে মনে প্রার্থনা করি, ভগবান, এই জনাবণ্যে মিশিয়ে দাও না
আমাকে, দর্শক হতে চাই, দ্রষ্টব্য নয়। কিন্তু সে প্রার্থনা বিফল
হোলো : শাড়ি এবং বাদামী চামড়া এই দ্বৈত পতাকাব মহিমায়
প্রতিষ্ঠিত থেকে আমি জনগণেব মুখে অপার বিস্ময় এবং আমার
সমভিব্যাহারী এবং সমভিব্যাহারিণীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তুলতে
লাগলাম। ভার্সাই-উদ্যানেব ফোয়ারাগুলি আমাকে চমৎকৃত কবলো
কিন্তু গাছগুলি দেখে আমি একাধারে হতাশ এবং দুঃখিত হলাম।
নিষ্ঠুর হাতে খর্বীকৃত, নির্মম কাঁচিতে ছাঁটা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন বেঁটে
বেঁটে আকৃতিমাত্র। বৃক্ষের নিজস্ব সত্তা আব নেই, ডালপালা নিয়ে
মনের আনন্দে তাকে বাড়তে দেওয়া হয় নি মোটেই, কাঁচির সাহায্যে
শুধু সবুজ রঙের একটি ফর্ম সৃষ্টি করা হয়েছে। যেন স্থাপত্যের
অনুকরণ করতে চেয়েছেন উদ্যানশিল্পী। প্যারিসে অন্যত্রও এই অত্যধিক
ছাঁটার রীতি লক্ষ্য করেছিলাম ; এমন কি, বলতে নেই, যদিও কথাটা
প্রায় ব্লাসফেমির মত শোনায়, তবুও, শাঁজেলিজে দেখেও আমার
একটা অনুরূপ ক্ষোভ হয়েছিলো। তাত্য়ানার সঙ্গে এই নিয়ে
আলোচনা বাধলো। ফরাসী উদ্যান-রীতিতে আর্টের স্থান বেশী,
আর ইংরেজরা বেশী পছন্দ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাগান।
ফরাসীদের বাগানকে যদি 'উদ্যান' বলি, তবে ইংরেজদের বাগানকে
বোধ হয় 'কানন' বলা যায়। 'উদ্যান', যে অর্থে দুষ্যন্ত বলেছিলেন,
'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ'। আর 'কানন', যে অর্থে

আমরা বলি 'নন্দনকানন'। দ্বিতীয় আইডিয়াটা বন-ঘেঁষা। তাত্য়ানা অক্সফোর্ডে থাকতে অনেক ইংরেজী কায়দার বাগান দেখেছিলো, কলেজগুলির অভ্যন্তরে তো বটেই, শহরের চার পাশের গ্রামাঞ্চলে অভিজাত পরিবারের অধুনা-অব্যবহৃত সম্পত্তির মধ্যেও একাধিক নিদর্শন ছিলো। কোনো কোনো বাগানে মিশ্র রীতি লক্ষ্য করা যেতো, কারণ ইংল্যাণ্ডের রীতির উপর, বিশেষত উচ্চ শ্রেণী আর রাজারাজড়াদের মধ্যে, ফরাসী প্রভাব অল্প-বিস্তর থাকবেই। বড়লোকদের বাগানে তাই এক দিকে বাড়ন্ত গাছ, স্তবকিত লতা আর ময়ূব, আবার অন্য দিকে কিছু ছাঁটা গাছের সারি একত্র নজরে পড়তো। তাত্য়ানা বললো—'ইংরেজরা গাছকে বড় বাড়তে দেয়। বাগানই যদি করতে হয়, তবে কিছু কাটছাঁট তো করতে হবেই। বাগান আর প্রকৃতি, দুটো তো এক বস্তু নয়। প্রকৃতিকে আপন মনে বাড়তে দাও, হবে জঙ্গল।'

—'কি আশ্চর্য, আমি কি অস্বীকার করছি', বলি আমি, 'প্রকৃতি আর বাগান এই দুয়ের মাঝখানে সীমারেখা টানতেই হবে। বাগান করার উদ্দেশ্য কী? একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে প্রকৃতিকে কিছুটা পোষ মানানোর চেষ্টা। বাগান নিশ্চয়ই মনোরঞ্জক হবে, কিন্তু তা হতে গিয়ে প্রকৃতির সত্তা যেন না হারিয়ে বসে। যে বাগান বৈশিষ্ট্যপ্রয়াসী তাকে কিছুটা অন্তত তপোবনের ইঙ্গিত তো বহন করতে হবে। অ-কৃপণ অ-ব্যাহত প্রকৃতির ঐশ্বর্য এবং আধ্যাত্মিকতার কিছুটা স্বাদ তো দিতে হবে। আসলে এটা সেই চিরকালের ক্লাসিক-রোমান্টিক দ্বন্দ্ব, কতটা রাখতে হবে, কতটা ছাড়তে হবে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ-ফরাসীর মতৈক্য কখনো হতে পারে ভেবেছো? শেক্সপীয়রের রীতি আর রাসীনের রীতি ভিন্ন থাকতেই বাধ্য। জাপানীদের হাতে বাগান

আবাব ডেকরেটিভ আর্টের চরম সীমায় পৌছয়, তাবা গাছকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ কবে দেয়—'

—'তুমি থামো তো', হেসে ওঠে তাত্য়ানা, 'তুমি তো ইংবেজদেব বাগানেও বিমর্ষ হও। যেমন ধবো লন, নিটোল-ছাঁটা মসৃণ সবুজ ভেলভেটের গালিচার মত লন জিনিসটি ইংরেজ মালীদেব একান্ত প্রিয়, কিন্তু তোমার চোখে তো তা-ও "কৃত্রিম" ঠেকে ! সেন্ট—হাউজেব বাগানে "ডেইজীধ্বংস" রব তুলে তুমি কি কাণ্ডটাই না করেছিলে !'

'কাণ্ড মানে ? যথার্থ করেছিলাম, দরকার হলে আবার কববো। যেখানে আমি ঘাসে চলতে সাবধানে পা ফেলি, সাবধানে চেয়াব পাতি যাতে ডেইজীরা যথাসাধ্য কম চাপ পায়, সেখানে একজন প্রৌঢ়া মালিনীর চিবস্থায়ী নির্দেশ-মত এক ছোকরা এসে নিমম বোলারে সব সমতল কবে দেবে ?'

জোজো আগ্রহী হয়ে ওঠে—'আপনি কি করলেন ?'

—'গভর্নিং বডিব চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবাদ পেশ করলাম। চসরের নজীর দেখাতে ভুললাম না। চসর ডেইজীকে বলেছেন ফুলের রানী, বসন্তের ডেইজীখচিত ঘাস যে দেখেছে তার বোঝা উচিত কেন তিনি এ সম্বোধন করেছিলেন। ভদ্রলোক মিটিমিটি হেসে শুনলেন, খানিকটা অবাক হলেন বইকি। সেটা ছিলো হাউজের সমবেত এক লাঞ্চের আসর; সবাই বিস্মিত। মিসেস ড্রজ্দভকে আগেই বলে বেখেছিলাম যে, আমি প্রসঙ্গটা তুলবো; তিনিও হাসছেন। লাঞ্চেব শেষে বাগানে মালিনীব সঙ্গে মোলাকাত। চেয়ারম্যান অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললেন, "মিসেস বার্ন, হাউজের একজন বাসিন্দা আপত্তি করছে তথাকথিত ডেইজী-ধ্বংসের বিরুদ্ধে। ইংরেজ কবিরাও নাকি থাকলে আপত্তি করতেন। বিশেষত মধ্যযুগের একজন কবি নাকি ডেইজীকে

ফুলের রানী বলে ডেকে ফেলেছেন। এরকম অবস্থায় কি করা যায় বলুন তো ?" মহিলা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, "ডেইজীকে কবিরা ফুলের স্থান দিয়েছেন ? আমরা তো ওকে আগাছার পর্যায়ে ফেলি।" সেখানেই তো গোলমাল ! অথচ সমস্যার একটা সমাধান চাই। ক্রমাগত বাড়তে দিলে ডেইজীরা তো মাঠ একেবারে ছেয়ে ফেলবে। এক হাত লম্বা ঘাসের মধ্যে নক্ষত্রের মত ফুটে থাকবে তাদের মুখগুলি। বাগান আর বাড়ির বাগান থাকবে না, হয়ে উঠবে flowery mead। এ চারা শখের গোলাপ নয়, অযত্নে বেড়ে ওঠে, তার কেয়ারি লাগে না, তাই তো মালীদের মতে স আগাছা। অগত্যা ঠিক হোলো, ডেইজীদের সপ্তাহখানেক করে করে রেহাই দেওয়া হবে। তত দিনে তারা যা বাড়বার বাড়বে, মাঠের শোভাবর্ধন করবে এবং দর্শকদের মুগ্ধ করবে, তারপর ঘাস মুড়িয়ে দেওয়া হবে। পরদিন থেকে আবার গজাতে শুরু করবে তারা। এ ব্যবস্থা ভালোই চললো। ডেইজীরা অবাধ্য বন্য চারা, তাদের বেশ কঠিন প্রাণ। এমনিতে তাদের উপর দিয়ে আলতোভাবে হেঁটে গেলে তারা মরে না, নত হয়ে আবার উঠে পড়ে। ঘাস মোড়ানোর পরও তাদের শিকড় অক্ষত থাকে। অনেক সময় দেখেছি সকালে রোলার চালানো হয়েছে, অথচ দুপুরের দিকে আবার সাদা সাদা বিন্দু উঁকি মারছে।'

তাত্য়ানা বললো—'জানো জোজো, পরীক্ষার আগে কেতকী অধিকাংশ দিন বাগানেই পড়া তৈরি করতো। ঐ ডেইজীদের দেখে দেখে "অনুপ্রেরণা" সংগ্রহ করতো। শেষ ক' দিনের জন্য মিসেস হজ্‌দভ নির্দেশ জারি করে দিলেন কেতকীর পরীক্ষা শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘাস কাটা হবে না। কেতকী আবার সে বাগানের

উপর একটা কবিতা লিখে আগেভাগে মারিয়াকে অনুবাদ করে শুনি
রেখেছে কিনা, কাজেই মারিয়ার মনটি তখন গলে আছে।'[২]

গল্পে গল্পে সেদিন ফিরতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে গেলো। ফেরার প
জোজো বললো, 'এখন ছাড়া পাচ্ছো না, চলো আমরা এলিজ
তুলে নিই আর কেতকীকে প্যারিসের বিমানঘাঁটি দেখিয়ে আনি।'

গ্যগল-কর্তৃক উদ্বোধিত প্যারিসের নবনির্মিত বিমানবন্দর সত্যি
দেখবার মত। প্যারিস শহরেরই একটা ছোটখাট নমুনা যেন উঠি
এনে কাচের ঘরে জীইয়ে রাখা হয়েছে। সব বিমানঘাঁটিতেই কি
কিছু দোকান থাকে, কিন্তু এখানে যেন শহরের সব পসরারই এক
বিচিত্র প্রদর্শনী। এমন কি আধুনিক চিত্রকলার নিদর্শন পর্যন্ত সাজা
আছে, অবশ্য বিক্রির জন্যে নয়। অবশেষে জোজো বললো, 'চলে
বিরাট বারান্দা থেকে বিমানের আসা-যাওয়া দেখা যাক।' সেখা
যেতে হলে একটি ছোট গেটে দক্ষিণা দিতে হয়। গেটে কিন্তু কে
নেই। জোজোরা খুব খুশী। গেট ডিঙিয়ে এগিয়ে যাই। পর্যটকদে
ভিড় আছে, কিন্তু কোনো বিমানের চিহ্নমাত্র নেই। সর্বত্র নির্জন
কোনো আলো নেই। অন্ধকারে সব থমথম করছে। অনেকক্ষণ পরে
কোনো প্রাণের চিহ্ন এলো না। 'বেশ হয়েছে', বলে উঠলে
তাতয়ানা, 'পয়সা দিতে হয় নি। এরোপ্লেন নেই, এয়ার হস্টেস
ঘোরাফেরা করছে না। জনশূন্য পরিত্যক্ত এ আবার কেমন এয়া
পোর্ট?' তাতয়ানার গলা কেউ কেউ শুনতে পেয়েছিলো, মজা পে
ফিরে তাকালো। তারপর শুনলাম। কী? না, ধর্মঘট! সেজন্যেই
দরজায় পয়সা নেবার জন্য কেউ ছিলো না। প্যারিসে কোনো প্লে

২. উল্লিখিত কবিতাটি হচ্ছে "মে মাসের গান", 'সবীজ পৃথিবী' সংকলনটি
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (১৯৮১)

আর নামছে না, গতি বদলে দেওয়া হচ্ছে, আর এখান থেকে ছাড়ছে না যে তা বলাই বাহুল্য।

ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জোজো—'খবরের কাগজ না পড়ার ফল!'

আমি কিন্তু অবাক হই নি। কয়েক দিন থেকেই প্যারিসে নানা-বিধ হরতাল লক্ষ্য করেছি। একদিন হোলো মেট্রোর হরতাল। আর একদিন লুভ্র্-এর দরজা থেকে ফেরত এসেছি; বিমর্ষ এক দারোয়ান জ্ঞাপন করলে, 'লা গ্রেভ', অর্থাৎ ধর্মঘট। আরও একদিন, দেশের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি ডাকে দেবো, মেয়রী দিসি মেট্রো স্টপের কাছে একজন পথচারীকে নিকটতম ডাকঘর কোথায় প্রশ্ন করেছি; সে পেলো মজা। আমার প্রশ্ন বিশেষ গ্রাহ্য না করে সে জানতে চাইলো আমি ইংরেজী জানি কি না। তারপর নিজের ইংরেজীজ্ঞান ফলাবার জন্য হাত নেড়ে বললো, 'নো লেত্র্, নো পোস্ত্ তুদে। লা গ্রেভ, স্ট্রাইক, ইউ সী।' আমি ব্যাকুলভাবে শুধালাম, 'ডাকঘর বন্ধ? ডাকটিকিট পাওয়া যাবে না?' সে তার একটি হাত অপর হাতের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে বললো, 'পোস্ত্ শাত্, ক্লোজ্ড্, লাইক দিস।' আমি কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। সেদিনটা কোনো ধর্মঘট ছিলো না সকালে তাত্য়ানার কাছে তাই শুনেছিলাম। রাস্তার মোড়ে খবরের কাগজ আর নানান পত্রপত্রিকার স্টল ছিলো, তার প্রৌঢ়া দোকানদারনীকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তার নির্দেশ অনুসারে অনায়াসেই ডাকঘর বার করলাম। দিব্যি খোলা, তবে কোনো খদ্দের নজরে পড়লো না। যে মহিলা ডাকটিকিট বেচলেন তাঁকে বিশেষ প্রসন্ন মনে হোলো না: ধর্মঘটের কিনারায় এসে পড়েছেন আর কি, পারলেই ঝাঁপ দেন!

জোজোকে সান্ত্বনা দিলাম। ঠাট্টা করে বললাম—'ভালোই

হোলো মঁসিয়ে। ফ্রান্সের একটা আভ্যন্তরীণ চিত্র পেলাম। কমাদে অসন্তোষ, বিক্ষোভ, হরতাল···দ্যগলের রাজত্বে আপনারা কিরক সুখে আছেন প্রত্যক্ষ জেনে গেলাম।'

—'বটে?'

—'না না, চটবার কিছুই নেই। হরতালের কথাই হচ্ছে। আমি হলাম কলকাতার লোক। সে শহরে বছরে ক'টা হরতাল হয় তা খবর তো আপনি রাখেন না। রাখলে আর আমার সামনে হরতালে দরুন লজ্জিত হতেন না!'

॥ সাত ॥

এক এক দিন সকালে চিলেকোঠার বিছানায় শুয়ে যখন উঠি উঠি
ন হোতো, তখন নিচ থেকে শুনতাম তাত্য়ানার গলা, ফোনে কথা
লছে।

—'আমি কি জাক দ্য লিয়ঁ-র সাথে কথা বলতে পারি?·· হ্যাঁ,
াক, বানান হচ্ছে···'

তারপর মিনিট কয়েক চুপচাপ। অতঃপর আবার সসংকোচে—
াপ করবেন, আপনি কে? ওঃ, দুঃখিত, না না, আমি জাক দ্য
য়ঁ-কে চাইছিলাম। দয়া করে ডেকে দেবেন কি? বানান হচ্ছে·· '

এরকম চলতো নির্ঘাত মিনিট দশ-পনেরোর বোঝাপড়া। কিছুক্ষণ
ব্ধতার পরই বোঝা যেতো যে, জাকের হদিস এখনও পাওয়া যায়
, এবং তাত্য়ানা ধৈর্যসহকারে চতুর্থ কি পঞ্চম ব্যক্তিকে 'জাক'
ামের বানান শোনাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে জাকের সন্ধান যদি বা মিলতো, তাত্য়ানার
ঙ্গে তার সর্বদাই বাধতো ফোনের মাধ্যমে ঝগড়া। কথা বলতো
িদক থেকে জাকই বেশী। তাত্য়ানা শুধু শুনতো, আর থেকে থেকে
াতর কণ্ঠে বলতো—'না, জাক, না, জাক, আমার কথা শোনোই না
কবার, দয়া করে শোনো, তুমি ভুল বুঝছো আমাকে···না, ঘটনা
ন্যরকম···না না, ব্যাপার তা নয়, তুমি কেন এরকম ভিন্ন মানে
রছো···তুমি আমার কথার বিকৃত মানে করছো···না না, আমি

তোমাকে অপমান করছি না, করতে চাই না মোটেও…’

মাদাম তো অফিসে চলে গেছেন। তাত্‌য়ানার গলা সারা বাড়ি জুড়ে ব্যাকুল আবেদন জানাতে থাকতো, আমি বিছানায় উ বসতাম। শেষের দিকে মনে হোতো যেন জাক তাত্‌য়ানার আবে অগ্রাহ্য করে চটে-মটে আচমকা ফোন ছেড়ে দিয়েছে, কা তাত্‌য়ানা কিছুক্ষণ ‘জাক্‌, জাক, শুনছো, এই জাক…’ ইত্যাদি ব আস্তে ফোন রেখে দিতো।

এ জাক যে সেই প্রাক্-বাস্তিল রজনীর নায়ক তা অনুমান কা ছিলাম। তাত্‌য়ানাকে প্রশ্ন করলাম—‘আচ্ছা, এই সকালে উ রোজ জাক-কে ফোন করার রহস্যটি কি ? জাক-ই কি সেই ফরা যুবক, যে তোমাকে বিয়ে করতে চায় ?’

—‘ঠিকই ধরেছো। ফ্রান্সে ছেলেদের বাধ্যতামূলক সামরি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জাক পড়ুয়া ছেলে দেখে এ ছুতো সে ছুতে করে আজ অবধি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু অবশেষে ওর ত্রিশ বছর পূ হবার সময় ঘনিয়ে আসছে, এখন তার আগে ওকে নির্দিষ্ট সম সামরিক তাঁবুতে কাটাতেই হচ্ছে। আমি সেখানেই ফোন কি ফোন যারা ধরে হয়তো তারা জাকের মতই শিক্ষার্থী, নয়তো তা সেখানকার দেখাশোনা করে। কিন্তু তারা এক এক মূর্তিমান। প্রথ তো নামটা কিছুতেই বুঝতে চায় না, তারপর ডাকতে বেরিয়ে কে যেন আর ফিরে আসতে চায় না। বুদ্ধুর দল—’

—‘কিন্তু জাকের সঙ্গে এরকম প্রবল বাদানুবাদ হয় কেন টেলিফোনেই বিবাহপ্রসঙ্গ আলোচিত হয় নাকি ?’

—‘প্রত্যক্ষভাবে হয় না, কিন্তু পরোক্ষভাবে হয়। এই টেলিফো নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়াকে আমাদের দু’জনকার সম্পর্কের প্রতী

াতে পারো। সামান্য সামান্য সব ঘটনাকে আশ্রয় করে আসে
ল বোঝাবুঝির পালা। অসম্ভব অভিমানী ছেলে জাক। একবার
দি ভুল বুঝতে শুরু করে তবে তাকে রোখে কারও সাধ্য নেই।
ামাকে তিলে তিলে জ্বালিয়ে খেলো। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরবার
র থেকেই নতুন করে শুরু হয়েছে আমাদের ঝগড়ার পালা।'

—'ওর সঙ্গে দেখা হয় না তোমার? নাকি শুধু ফোনেই
যোগ?'

—'হয় বইকি। লাইব্রেরীতে চলে আসে ও। যেখানেই বসি,
ক খুঁজে বার করে। তারপর কথার ধারে আমাকে কাটতে থাকে।
মন ধরো, তোমার আসার কথা ওকে আগেই বলেছিলাম। না
লে রক্ষে আছে নাকি? নইলে বলবে, আমি আমার জীবনের
তক কতক অংশ "ব্যক্তিগত" মার্কা মেরে ওর থেকে দূরে সরিয়ে
খতে চাই। তারপর সেদিন তোমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে। ও চেয়ে-
লো যে, চোদ্দ তারিখে আমাকে একটা নাচে নিয়ে যায়; কিন্তু
ানোই তো, তের তারিখের সেই মস্ত গাড়ি-চড়ার পর সারা দিন
ামরা প্রায় নড়তে-চড়তে পারি নি; তা ছাড়া তুমি নতুন অতিথি
বে এসেছো, কবে থেকে ঠিক করে রেখেছি চোদ্দ তারিখে সন্ধ্যায়
ার্দ-র উঁচু জমি থেকে দূরে প্যারিসের বাজী আর আলোর খেলা
দখাবো তোমাকে; অতিথি ফেলে কি করে বান্ধবের সাথে নৃত্যোৎ-
বে যাই বলো তো? কাজেই আমি ওকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত
রতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও বোঝে নি কিছুতেই! নতুন বন্ধুর জন্য
ওকে অবহেলা করছি, তোমার অজুহাত দিয়ে ওর কাছ থেকে দূরে
রে যাবার চেষ্টা করছি, ওর কাছে ধরা দিতে চাইছি না, ইত্যাদি
ইত্যাদি নানান ব্যাখ্যা করেছে ও। তাই আমি পরে একদিন বললাম,

চলো, তোমার সঙ্গে অন্য একটা নাচে যাবো, আমাদের অতিথি এ
পুরোনো হয়ে গেছে, পথঘাট চিনেছে, এখন একটা সন্ধ্যা একা থাকা
পারবে। ওব প্রতিক্রিয়া হোলো অদ্ভুত। বললে, কী? আমি বু
খেলার পুতুল, না ঘুঁটি? তোমার ইচ্ছা হলে নাচে যেতে হবে,
হলে যেতে হবে না? অনেক তিক্ত কথাকাটাকাটি হোলো। পর
ফোনে বললাম, এখনও ভেবে দেখো, আজ সন্ধ্যায় আমি তোম
সঙ্গে নাচে যেতে পারি। সেদিন তো ও দড়াম করে ফোনই রে
দিলো। প্রায়ই দেয় অবশ্য। আসলে কি জানো, আমার সঙ্গে না
বাব ইচ্ছা থাকলেও বাস্তব অবস্থাটির মুখোমুখি হতে ও যেন দ্বিধাগ্রস্ত
নইলে বেছে বেছে এমন অবস্থা ও কেন ঘটায়, যাতে ওর যখন ই
তখন আমি কোনো জরুরী কাবণে আটকে পড়ায় যেতে পারি ন
আর যখন আমি যেতে প্রস্তুত তখন ও অভিমান করে ভাসায়? এ
কি আমার সম্বন্ধে ওর অবচেতন মনের এক বিচিত্র জটিল ক্রি
প্রকাশ পায় না? বিশ্বাস করো, আমার সঙ্গে খিটিমিটি বাধাতে
সত্যিই ভালোবাসে। সেটাই ওর স্বভাবে পরিণত হয়েছে। যে
ও ভয় পায় আমাদের মধ্যে শান্তি, সৌহার্দ্য, মন বোঝাবুঝি বেশীক্ষ
স্থায়ী হবার নয়, অথচ আমাকে সম্পূর্ণ ছাড়তেও পাবে না।
আমাদের অস্তিত্ব অন্যোন্যনির্ভব হয়ে পড়েছে। কাজেই এই সম্পর্কটু
বজায় রাখার জন্যেই ঝগড়া বাধায়। সম্পর্ক হতে পারে দু' বকমে
—প্রীতির আর কলহের। দুয়ের একটাও যদি না থাকে তাহলে (
অবস্থার নাম হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কে ঔদাসীন্য, অর্থাৎ সম্পর্কের ইতি
জাকের প্রথম প্রতিজ্ঞা হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে একটা স্থা
মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠা আর সম্ভব নয়। হয়তো ওর প্রস্তাবে রা
হতে আমি এত সময় নিচ্ছি দেখেই ও ধরে নিয়েছে, আমা

ম্ম জীবন হবার কোনো আশা নেই। ও সাংঘাতিক নৈরাশ্যবাদী।
কে যে আমি এত স্নেহ করি অথচ বিয়ে করবার বেলায় সাতপাঁচ
াবি আর দেরি করার ছুতো খুঁজি, তাতে ও মর্মে মর্মে বিদ্ধ। আমার
নে সংরাগের তীব্রতা না জাগাতে পারার দরুন ও ক্ষুব্ধ এবং আত্ম-
ানিবিজড়িত। অথচ আমাকে ছাড়া চলে না ওর, যেমন আমারও
লে না ওকে ছাড়া। আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, আমরা
রস্পরের বিষয়ে উদাসীন, এ অবস্থা অসহ্য। জাক তা কল্পনা করতে
ারেও না, চায়ও না। কাজেই সম্পর্ক একটা জীইয়ে রাখতেই
বে। মধুর যদি না হোলো তবে তিক্তই থাক। ঝগড়ার মাধ্যমে
আমাদের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে জাক।
সাম্প্রতিকতম কাহিনীটি শোনো। মাঝখানে সে হঠাৎ খেয়ালবশত
্যারাকে রাত্রিযাপন দুঃসহ মনে করে তিন রাত বিনা অনুমতিতে
বাইরে কাটিয়েছে। গ্রামে কোন এক মাসী না পিসীর বাড়িতে। ধরা
হয়তো পড়তো না, কিন্তু আমি তো কিছু জানতাম না, ঘটনাচক্রে
তৃতীয় রাতে আমি ফোন করেছি। তখন ওদের খেয়াল হয়েছে, জাক
তো নেই। আমি জানি না ওদের ভিতরের ব্যবস্থা কি। দিনের বেলা
ড্রিলের সময় নাম-ডাকা নিশ্চয় হয়। ও দিনে বোধহয় থাকতো, কিন্তু
রাতে ফেরে নি। বিনা অনুমতিতে রাতে বাইরে থাকা কি সাংঘাতিক
অপরাধ বুঝতে পারছো? বিশেষত মিলিটারীদের কাছে? অক্স-
ফোর্ডের কলেজের মত! ওর কি শাস্তি হোতো জানি না, তবে শেষ
পর্যন্ত ও সাহায্যের জন্যে আমারই দরজায় প্রার্থী হোলো। কী? না,
ও বলবে, ও সেদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর মাসী বললো, কাজ
নেই, আজ রাতটা এখানেই থেকে যা, এবং প্রমাণস্বরূপ ডাক্তারের
সার্টিফিকেট চাই। কোন ডাক্তার এ হেন সার্টিফিকেট যোগাবে

লা ? জাকের পরিচিত কোনো ফরাসী ডাক্তার ? কখ্খনো । তবে ? কেন, তাত্য়ানার পরিচিতা কোনো রুশ ডাক্তারনী। মিগ্রে রুশ সমাজে যুবতী ডাক্তারনী কি কেউ নেই ? তাদের ধ্যে কেউ কেউ কি তাত্য়ানার পরিচিতা, চাই কি এক স্কুলের য়ে বা ঐ গোছের হতে পারে না ? অগত্যা জাক সহ হাজিরা দিয়ে নাইপানাই গল্প ফেঁদে আমার এক ডাক্তার বান্ধবীর কাছ কে সার্টিফিকেট যোগাড় করে দিলাম। কে কার জন্যে এতটা রে বলো ? নিনা আমার অনেকদিনের চেনা মেয়ে দেখেই এতটা রলো তো ? কিন্তু সে যাত্রা রেহাই পেয়ে জাকের শিক্ষা হয় নি। ল্টে ও সিদ্ধান্ত করেছে যে, এভাবে বাজে সার্টিফিকেট দেখিয়ে ারও রাত বাইরে কাটানো যাবে। আমাকে বলছে আবার ার্টিফিকেট যোগাড় করে দিতে। আমি বলছি, জাক, বোঝবার ষ্টা করো, এ ধরনের আবেদন দ্বিতীয়বার করা সম্ভব নয়। ও কছুতেই বুঝছে না, বলছে, বুঝেছি, একবার সাহায্য করে তোমার হংকার হয়ে গেছে, আর করবে না। আমি বলছি, ছাখো, বান্ধবীব াছে বারবার মিথ্যা গল্প ফাঁদা যায় না। ও বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, জানা াছে রুশ ডাক্তারদের সত্যনিষ্ঠা। এইভাবে ও আমাকে বিঁধছে, াজেকেও বিঁধছে। এ সম্পর্ক থেকে আমার মুক্তি আছে কিনা ানি না। জীবনটাকে যদি নতুন কোনো মোড় দেওয়া যেতো, বেশ াতো। একটা নতুন ফ্ল্যাট, একটা নতুন গাড়ি, নতুন কোনো মানুষ। বে জাককে ফেলে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারি না, বুকের ভিতরটা নটন করে ওঠে।'

'তবে জাক-কেই বিয়ে করো না। হয়তো বিয়ের পরে সম্পর্ক হজতর হয়ে আসবে।'

—'হয়তো করবো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির ক
উঠতে পারি না। আমার মা-মাসীরা বিয়েতে কেউই সুখী হন নি
জেনে-শুনে ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটাতে চাই না।'

তাত্‌য়ানার দিদিমা শুধু তাঁর বড় মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথাই বল
পেরেছিলেন, অন্যদের কথা বলার সুযোগ পান নি। ছুটির এক দুপু
মাদাম আস্তনভকে বাগানের টেবিলে তরকারি কাটতে সাহা
করছি, তিনি নিজেই শুরু করলেন নানান গল্প। তখনই জানলাম, তাঁ
এক বোন থাকেন আর্জেন্টিনায়, অন্য বোন আমেরিকায়, এবং তাঁদে
স্বামিসম্পর্ক ছিন্ন। ভাগ্যের কি পরিহাস, বাস্তুচ্যুত তিন বোনে
কাউকেই তাদের স্বামীরা পূর্ণ মর্যাদা দেয় নি। বাপের বাড়ি যাদে
গেছে, স্বামীরা তাদের ঘর দিয়েও আবার নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিয়েছে
তবে সুখের কথা, মাদামের মত তাঁর বোনেরাও শিক্ষিতা এব
মোটামুটি শান্তিতেই জীবনযাপন করতে পারছেন। কৌতূহল প্রকা
অশোভন হবে জেনে কথা ঘোরাবার জন্য মাদামকে তাঁর নিজে
সন্তানদের সম্বন্ধেই প্রশ্ন করলাম। বুদ্ধিমতী মায়ের চোখ দিয়ে
সন্তানদের যে চিত্র পাওয়া যায় তার বিশেষ দাম আছে। মাদা
নার্সিসিয়েনের চোখে দেখেছিলাম তাঁর সন্তানদের, এবারে মাদাম
আস্তনভের চোখে তৃতীয় জীবিত পুরুষের চিত্র দেখতে উৎসুক হলাম।

—'আচ্ছা মাদাম, যে ঘরে পিয়ানোটা আছে তার দেয়ালে
ছেলেমেয়েদের যে গ্রুপ ফোটোটা আছে সেটা কবে তোলা?'

—'সেটা বেশ কয়েক বছর আগে তোলা, এ বাড়িতে আসার
আগে। যখন তাত্‌য়ানার বাবার সঙ্গে থাকতাম। ম্লান হয়ে গেছে,
তাই না? কিন্তু তাকালেই কি মনে হয় না, একটি সুখী পরিবারের
সন্তান ওরা? দুটি মিষ্টি ছেলে, একটি বেণী-দোলানো মিষ্টি মেয়ে।

আহা, কি সাজানো সংসার ছিলো আমার। আমার মা কি তোমাকে বলেছেন নাকি যে, রান্নাবান্না বিষয়ে আমি কুঁড়ে প্রকৃতির? কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়! বিয়ের পর ঘরের কাজ আমাকে কমই করতে হোতো। প্রথম প্রথম আস্তনভ আমাকে সুখেই রেখেছিলো। ঝি ছিলো, ঝকঝকে আসবাব ছিলো, গাড়ি ছাড়া চলাফেরা করতাম না। যাক গে সেসব কথা···। আমার ছেলেপিলেদের কথাই বলি, ওদের নিয়েই আমার এখনকার যা কিছু সুখ। আমার বড় ছেলের পড়াশোনায় মন কম ছিলো, বড্ড আড্ডা দিয়ে বেড়াতো। মাথায় বুদ্ধি থাকলেও বইপত্রের দিকে সময় দিতে চাইতো না। বাপ নেই মাথার উপরে, কে দেখে, কে শাসন করে। আমার ছোট ভাই দেখলে যে, প্যারিসে থাকলে ও শুধু টো টো করে ঘুরে বেড়াবে, তাই ওকে ক্যানাডায় পাঠিয়ে দিলে। বিদেশে যাওয়াতে ওর একটা নতুন দায়িত্বজ্ঞান এলো। পরীক্ষা পাস করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট হয়েছে। ভালোই চাকরি করছে, একবার টিকিটপত্র কেটে পাঠিয়ে আমাকেও ক্যানাডা দেখিয়েছে, এখন তাত্য়ানার ইচ্ছা একবার যায়। তবে ও এখন প্রায়ই দেশে চলে আসার কথা বলছে। ফরাসী নাগরিকত্ব বদলায় নি, এমন কি রীতিমত দেশপ্রেমিক হয়ে পড়েছে। বিদেশে গেলে খাটে ছেলেরও কেমন মহৎ সব ভাব গজায় দেখছো? ফ্রান্সে চাকরির ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভিড়, অনেক বেশি ঘেঁষাঘেষি, মাইনেও পাবে কম, কিন্তু তবু এখানেই ওর যত মায়া। তাত্য়ানার সঙ্গে ওর স্বভাবের খানিকটা মিল আছে! ওরা দু'জনেই একটু দিশেহারা গাছের, কি যে চায় নিজেরাই যেন জানে না। আমার ছোট ছেলে, যটা তাত্য়ানার পিঠোপিঠি, আর যার সঙ্গে তাত্য়ানার অষ্টপ্রহর নস্যুটি, তার স্বভাবটা অন্যরকমের। ভাই বা বোন বিয়ে করুক কি

না-করুক, সে ঠিক যথাসময়ে নিজের বিয়েটি সেরে নিয়েছে। মোটা-মুটি চাকরিও একটা জুটিয়ে নিয়েছে। বিয়ে করেছে ফরাসী মেয়ে। মেয়েটি বেশ, তবে আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায় না। আমরা এমিগ্রে, উদ্বাস্তু, ফ্রান্সের শরণার্থী হয়ে এককালে এসেছি, নানারকম উত্থানপতন, ভাগ্যবিপর্যয় আমরা দেখেছি। সংগ্রাম করে করে আমাদের বাঁচতে হয়েছে। কিন্তু সে মেয়ে আদরের দুলালী, আর দু' চারটা ফরাসী মেয়েব মত পোশাক-আশাক এসেন্স এসবের মধ্যেই তার জীবনের পরিধি। বিয়ের পব আমাদের এখানে—হ্যাঁ, এই বাড়িতেই—এক বছর ছিলো ওবা। কিন্তু ফরাসী মেয়ের ধাতে সইলো না শাশুড়ী-ননদের সঙ্গে ঘর করা। আমরা আরমানীরা এরকম যৌথভাবে থেকে অভ্যস্ত, জোজোদের দেখেছো তো? কিন্তু আজ-কালকার মেয়েরা তা পারে না, তার অনেক কারণ আছে। তাত্‌য়ানাই কি পারবে? তা ছাড়া, এ বাড়িটাতে কোন নববিবাহিত সংসার পাততে চাইবে বলো? আমরা তো নেহাত দায়ে পড়ে আছি। উপরন্তু ছেলেপিলের প্রশ্ন আছে। এখন ওদের দুটি ছেলে-মেয়ে হয়েছে, জায়গাতেই কুলাতো না এমনিতে। নতুন বাসায় উঠে গেছে ওরা। তাত্‌য়ানার সঙ্গে আমার ছেলের বউয়ের বনে না। এমনিতে সামনাসামনি ভদ্রতা কুটুম্বিতা অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু ঐ যা বলছিলাম, জীন আমাদের পরিবারের পটভূমিকা বুঝতে বা জানতে চায় না, আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ওর আগ্রহ নেই। তাত্‌য়ানা পড়ুয়া মেয়ে, জীনের ইনটেলেকচুয়ালিটির কোনো বালাই নেই, সে অন্য জগতের বাসিন্দা। রুশ-আরমানী আচারব্যবহার রীতিনীতি এসব নিয়ে আমাদের যে গর্ব তার তাৎপর্য জীন বুঝতে পারে না। আমাদের পরিবারের সংস্কৃতিগত যে বিশেষ রূপ তাকে

আপন করে নিতে ও ঔৎসুক্য দেখায় না কখনো। তাত্য়ানার জানো তো রুশ ভাষা নিয়ে কত গর্ব, জীন কিন্তু রুশ শিখবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করে নি। ওরা ফরাসীতে কথা বলে, ছেলেমেয়েরাও তাই। কাজেই এই পুরুষ থেকে একজন আস্তনভ সম্পূর্ণ ফরাসী হয়ে গেলো, এই নিয়ে দুঃখ আর কি।

চকিতে মনে পড়ে গেলো তাত্য়ানার সেই আত্মপরিচয়দান: 'আমি ফরাসী।' সেই দৃপ্ত স্বীকৃতির পিছনে যে কতরকমের আবেগ-জগৎ আছে তা কি তখন সবটা বুঝেছিলাম? তার মধ্যে আছে অভিমান, আছে তার রুশ-আরমানী পূর্বপুরুষদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কচ্ছেদ। তার রক্ত, পারিবারিক শিক্ষা এবং ধর্মের টান সত্ত্বেও সে ভুলতে পারে না, সে এমিগ্রে মাত্র; যে রাষ্ট্র তাকে পালন করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে, নাগরিকের অধিকার দিয়েছে, তার প্রতিই সর্বজনসমক্ষে সে আনুগত্য প্রকাশ করে। তার রুশ বাবা তার দেখা-শোনা করে নি, কিন্তু ফরাসী দেশ করেছে। প্রকৃত পিতৃপরিচয়ের থেকে পালক পিতার পরিচয়ই তাই বড় হয়ে উঠেছে। কর্ণ যেমন কুন্তীকে প্রকৃত মা জানার পরেও সূতপত্নীকে মা বলে ডেকেছিলেন, এ-ও তেমনই। অথচ অন্তরে অন্তরে তাত্য়ানা তার রুশ উত্তরাধি-কারের কথা কখনও ভুলতে পারে না। তাত্য়ানা প্রকৃত অর্থে বাইলিংগুয়াল বা দ্বিভাষিণী ছিলো। তবুও দুটির মধ্যে রুশই তার ঘরের ভাষা। সেই ভাষাতেই তারা তিনটি ভাইবোন খাবার টেবিলে গল্প-গুজব করেছে, মায়ের কাছে আবদার জানিয়েছে। অথচ তার ভাইয়ের সংসারে সে ভাষার আর কোনো স্থান থাকবে না, তার ভাইপো-ভাইঝিরা জানবে না সে ভাষা। এই বিয়ের মাধ্যমে তার ভাই যেন আনুষ্ঠানিকভাবে তার উত্তরাধিকারকে পরিত্যাগ করে

চলে গেলো। তাত্‌য়ানা জানে, এটা হবেই। এ পুরুষে না হোক, পরের পুরুষে তাদের ফরাসী হয়ে যেতে হবেই। তবুও দুঃখ হয় বইকি।

তাত্‌য়ানার ছোট ভাই সপরিবারে ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলো। আমি থাকবার শেষের দিকে ফিরলো। দেখাও হোলো একদিন। সেদিন আমি একাই ছিলাম বাড়িতে। চিলাকুঠি থেকে শুনি সদলবলে কারা যেন বাড়িতে ঢুকে হইচই করে জিজ্ঞাসা করছে 'বলি বাড়ি আছো-টাছো কেউ ?' দ্রুতপদে নেমে আসি। তাত্‌য়ানার মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন মুখের একটি হাসিখুশী যুবক. একটি সলজ্জ মুখের ফরাসী যুবতী। কোলে এক সন্তান, আর একটি হাঁটি হাঁটি পা পা। চিনতে পারলাম তাদের। তারাও চিনলো আমাকে।

—'তাত্‌য়ানার ভাই ?'

—'বলা বাহুল্য। এবং আপনি তাত্‌য়ানার ভারতীয় বান্ধবী।'

তারা বেশী ক্ষণ বসলো না। বললাম—'আপনাদের ধরে না রাখতে পারলে কিন্তু তাত্‌য়ানা আমার উপর চটবে, কোন মুহূর্তে আপনি ফিরবেন তার প্রতীক্ষায় সে আছে, কারণ আপনার পরামর্শে সে অবিলম্বে গাড়ি কিনতে চায়।'

খুব হাসলো আন্তনভ জুনিয়র। বোনের আর মায়ের জন্য একটা চিরকুটে চিঠি লিখে গেলো।

তিন ভাইবোনের মধ্যে ছিলো তীব্র টান। ভাইয়েরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা-বোনের প্রতি পুরো কর্তব্য করতে পারে নি। দু'জনেই আস্তে আস্তে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে। ছোটজনের অজুহাত সে বিয়ে করেছে, তার পরিবার বড় হয়ে গেছে, সে আর পারে না। বড়জন কেন পাঠায় না কে জানে। অত দূর থেকে সে খবর বার

বেই বা কে। মাদাম ছেলেদের টাকা আর নিতে চান না। কিন্তু
খিনী মাকে যে বুড়ো বয়সে আজও মেট্রোয় করে দৈনিক আপিস
তে হচ্ছে, থাকতে হচ্ছে এই ভাঙা চালের নিচে, সেজন্য ভাইদের
র তাত্য়ানার প্রচণ্ড অভিমান।

—'মাকে একটা ফ্ল্যাট যোগাড় না করে দিয়ে ওরা কি করে
জেরা সুখে থাকতে পারছে? কি করে তাদের একজন বিয়ে
রছে?'

মাদাম বলেন তাত্য়ানা তার ভাইয়ের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে
বার বিরুদ্ধে ছিলো। সে চেয়েছিলো আগে তারা তিনজনে মিলে
কে একটা নতুন বাসা যোগাড় করে দিক। কিন্তু প্রেমে-পড়া
রুণ সে নিষেধ মানে নি।

—'আমি বলি, চাই না আমার ওদের টাকা। ওরা যে মানুষ
য়েছে, নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা মেটাতে পারছে, তাই আমার
থেষ্ট। আমার তাত্য়ানা কিন্তু বড় ভালো, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে।
ণয পর্যন্ত এই মেয়েই আমাকে বাসা যোগাড় করে দেবে তা আমি
নি। জানো কেতকী, ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই মায়ের দুঃখটা
বশী বোঝে। ছেলেরা বড় বাউণ্ডুলে, বড় ঘর-ছাড়া। তাত্য়ানা যে
াজও বিয়ে করতে পারে নি তার অন্যতম কারণ আমার শেষ
ীবনের জন্য একটা ব্যবস্থা না করে ও আমাকে ছেড়ে যেতে চায়
া।' মনে হোলো যেন কোনো বাঙালী বিধবার গলা শুনছি। সেই
এক সমস্যা, ছেলেরা মাকে মাসোহারা পাঠাচ্ছে না, বোনের বিয়ে না
দিয়ে নিজেরা বিয়ে করে নিচ্ছে, মা আঁচলে চোখ মুছে বলছেন, 'আজ-
কাল বুড়ো বাপমায়ের জন্য মেয়েরাই বেশী করে।' আর ছেলেদের
বাউণ্ডুলে বলার মধ্যে বিশ্বাসহন্তা স্বামীর প্রতি পুরোনো অভিমানটাও

যেন জেগে ওঠে। মাদাম আস্তনভ সেই নারী, যৌবনে স্বামী যাঁ
বেশী দিন ঘর দেয় নি, আজ শেষ জীবনে ছেলেরা যাঁকে একটা ঘ
দিলো না। তাত্য়ানা আস্তনভ সেই মেয়ে, যাকে তার রুশ বা
ত্যাগ করেছে, যার অভিভাবক তার আরমানী ছোটমামা, যার দা
ক্যানাডায়, যার ছোট ভাই ফরাসী বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে
মাদাম নার্সিসিয়েন সেই ভিটেচ্যুত বুর্জোয়া বৃদ্ধা, যিনি সন্তানদের জ
আপ্রাণ করেও আজ শেষ বয়সে কারো ঘরে সোয়াস্তি পেলেন ন
ছোট হোল্ডলটা নিয়ে আজ এ ছেলের ঘর, কাল ও ছেলের ঘর ক
বেড়ান। বিধবা বৃদ্ধা, স্বামিপরিত্যক্তা প্রৌঢ়া, অবিবাহিতা যুবত
পুরুষ অবলম্বনের অভাবে তিন নারীর জীবনই কিছুটা দিশাহারা
বিচিত্র তাদের জীবনের দ্বন্দ্ব। ভাবলাম, জাক-কে বিয়ে করে
তাত্য়ানার যে অনিশ্চয়তা তার পিছনে একাধিক কারণ আছে
ফরাসী বিয়ে করে ফরাসী হয়ে যাওয়া—এমিগ্রে জীবনের চরমত
কম্‌প্রোমাইজ। মাথা নোয়াতে চায় না তাত্য়ানা। তার চাই
সম্পূর্ণ বিদেশীকে—আফগানকে বা ইংরেজকে—বিয়ে করাও সহজতর
এ ছাড়া আছে তার মায়ের একটা ব্যবস্থা করে দেবার প্রশ্ন
ভাইয়েরা যখন তাদের কর্তব্য করলো না, তখন বোনই আইবুড়ো
থেকে মায়ের প্রতি কর্তব্য করুক।

তাত্য়ানার ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে উঠলো না
দেখতে দেখতে এসে গেলো আমার যাবার দিন। এ ক'দিনে বাড়ি
লোক হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে যতজনকে জানতে পার
যায় তাদের মধ্য থেকে খুব কমজনকেই কাছে রাখতে পারা যায়
এ ক'টি দিনে যারা আমার আত্মীয়ের মত হয়ে উঠেছিলো, তাদের
ছেড়ে চলে আসতেই হোলো। মাদাম নার্সিসিয়েন পর্যন্ত ক্ষীণ দৃষ্টি

য়ে জিনিসপত্র গুছাতে সাহায্য করলেন। ভোরবেলা আমার যাবার সময়। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে উঠলো তাত্য়ানা। মা, দিদিমা আর আমাকে জাগালো। আমাকে বিদায় দেবার জন্য মাদাম নার্সিসিয়েন আগের রাতটা এ বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। ফোন করে ট্যাক্সি আনানো হোলো। দরজায় দাঁড়িয়ে ছলছল হয়ে এলো দিদিমা আর প্রৌঢ়া মায়ের চোখ। বারবার আমাকে আশীর্বাদ করলেন তাঁরা। আমার আসন্ন মৌখিক পরীক্ষার জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মাদাম আস্তনভ বললেন,—'আবার যখন আসবে তখন আমাদের এই চমৎকার প্রাসাদ, এই দুর্গটিতে দেখবে না আশা করি। প্রার্থনা করো যেন নতুন বাসা পাই একটা।'

মাদাম নার্সিসিয়েনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, আমাকে মাথার উপর চুমু খেয়ে চোখ মুছলেন।

তাত্য়ানা আমার সঙ্গে চললো টার্মিনালে পৌঁছে দিতে। নির্জন পথঘাট। বাঁকে বাঁকে সেতু নিয়ে সেইন নদী শুয়ে আছে। ভোরের ঘোলাটে আকাশে হঠাৎ জেগে উঠলো মহীয়ান্—অথবা মহীয়সী—নোত্র্ দাম্। চোখ ফেরানো যায় না। দিনের বেলা দেখেছি লোকের ভিড়ে, পর্যটকদের কোলাহলের মধ্যে। উষার মৃদু আলোয় এখন দেখলাম তার ভাস্বর স্বরূপ। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে ভোরের আলোয় লণ্ডন শহর দেখে যেমন ওয়র্ডসওয়র্থ অভিভূত হয়েছিলেন, আমিও এ ক্ষেত্রে সেরকম মুগ্ধ হলাম। নাগরিকেরা এখনও সুপ্ত। অবিনশ্বর নোত্র্ দাম্ প্রসন্নমূর্তিতে শূন্য নগরীকে নিরীক্ষণ করছে। ট্যাক্সির জানলা থেকে প্যারিসের বিশ্বনাথমন্দিরের উদ্দেশ্যে আমার শেষ প্রণাম রাখলাম।

তাত্য়ানার জীবন নিয়ে লিখবার অধিকার তাত্য়ানাই দিয়ে-

ছিলো। সে সংকল্প এতদিনে পূর্ণ হোলো। বছর ঘুরে গেছে, তাত্য়ান
গাড়ি কিনেছে এবং টুইশনি করে টাকা জমাচ্ছে। তবে বাসাবদলে
টাকা এখনও হয় নি। জাক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য মাদাগাস্কা
গিয়েছিলো, এতদিনে বুঝি বা ফিরেছে।[১]

---

১. এই কাহিনীর পরিশিষ্ট হিসেবে কিছু বলা উচিত হয়তো। 'নারী, নগরী
যখন ধারাবাহিকভাবে 'দেশ'-এ বেরোয় তখন তাত্য়ানাকে দু'-এক স
পাঠানো হয়। ওর বড় ভালো লেগেছিলো অলোক ধরের আঁকা স্কেচগুলি
'নিজেকে যে চিনতে পারছি,' বলেছিলো। ব্রাইটনে আমাদের ডেরায় একবা
এসেছিলো তাত্য়ানা, কিন্তু তার পর বহুকাল ওর সাথে যোগাযোগ রাখতে
পারি নি। দোষ আমারই, আমিই পারি নি চিঠিপত্র লেখা বজায় রাখতে।
তাত্য়ানাও এদিক ওদিক আমার ঠিকানার খোঁজ করে নিরাশ হয়েছে। সম্প্রতি
ওর সাথে আবার সংযোগস্থাপনের চেষ্টা করি। আমার ধারণা হয়েছিলো যে
ওকে আর খুঁজে পাবো না, ভাবছিলাম মিনাসদের বাড়িতে খোঁজ করতে যেতে
হবে, হয়তো বা তারাও আর সেখানে নেই, কিন্তু টেলিফোন ডিরেক্টরি
ঘাঁটতে ঘাঁটতে পুরোনো ঠিকানাতেই ওর ফোন নম্বর পাওয়া গেলো এবং
ডায়াল করতেই পাওয়া গেলো ওর গলা। ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বরে ঘণ্টা-
খানেকের জন্যে প্যারিসে ওর সাথে দেখা হয়। তাত্য়ানা এখনও অবিবাহিতা,
ডক্টরেট করেছে, একটা চাকরি করে, মায়ের সঙ্গে সেই বাড়িটাতেই থাকে
এখনও, যদিও ওর বর্তমান সংকল্প হচ্ছে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে সেখানে একটা
নতুন বাড়ি তোলা। দিদিমা মারা গেছেন। তাত্য়ানা আরও অনেকটা
ফরাসী হয়ে গেছে এবং ইংরেজীও অনেকটা ভুলে গেছে,—জানালো যে এটা
হয়েছে আমার সঙ্গে ইংরেজীতে আড্ডা মারবার সুযোগের অভাবেই! সব শেষে
জানাই যে তাত্য়ানা আস্তনভ আমার বান্ধবীর আসল নাম নয়, এবং এ
কাহিনীতে ব্যবহৃত আরও কয়েকটি নামও ছদ্মনাম।